দাম : ৭০ টাকা

# স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২৪
১৮ সেপ্টেম্বর - ২০১৭

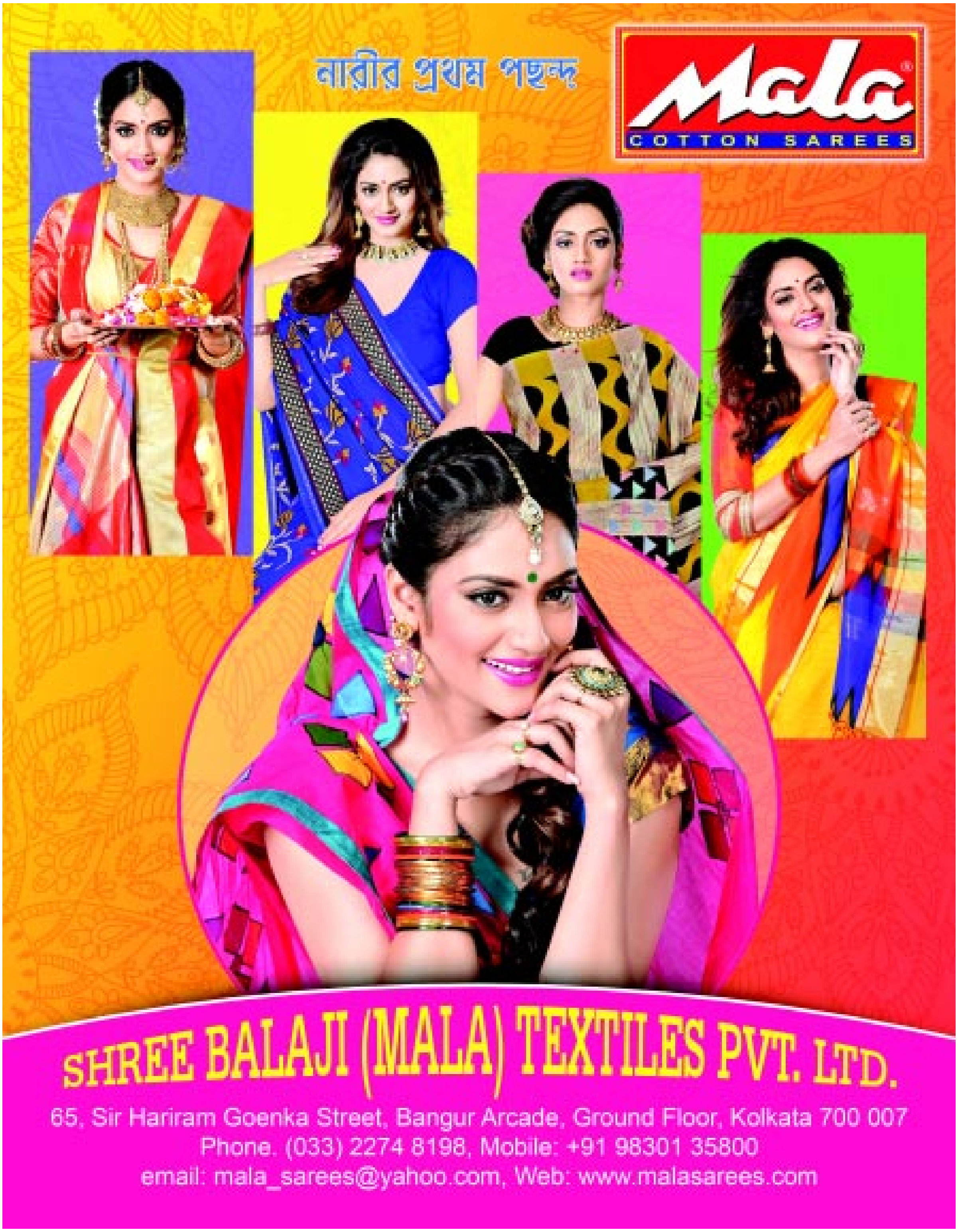
নারীর প্রথম পছন্দ
Mala
COTTON SAREES
SHREE BALAJI (MALA) TEXTILES PVT. LTD.
65, Sir Hariram Goenka Street, Bangur Arcade, Ground Floor, Kolkata 700 007
Phone. (033) 2274 8198, Mobile: +91 98301 35800
email: mala_sarees@yahoo.com, Web: www.malasarees.com

ফ : ১

With Best Compliments From :

emami

# EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN IS0 9001 : ISO 14001 : 0HSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

**Manufacturers of**

**International Quality Packaging Board**

**Coated Grey Back Board, Folding Box Board and SBS Board (White)**

**High Quality White and Pink Newsprint**

**S. S. Maplitho, Writing & Printing and Ledger Paper.**

* * *

**Registered Office :**

1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, ACROPOLIS, Unit No. -1
15th Floor, Kolkata - 700 107, (West Bengal)
Phone : 6627-1300/1301, Fax : (033) 6627-1338
**E-mail : emamipaper@emamipaper.in**
**Website : www.emamipaper.in**

**FOR BUSINESS ENQUIRY - CONTACT :**
**Mr. Soumyajit Mukherjee,** Asst. Vice President (Marketing and Sales),
**Mob. +91 9051575554, E-mail : soumyajit@emamipaper.in**

**Unit Gulmohar**
R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata - 700 035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/ 65409610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.in

**Unit Balasore**
Vill. - Balgopalpur
P. O. Rasulpur,
Dist. - Balasore (Odisha) - 756 020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.in

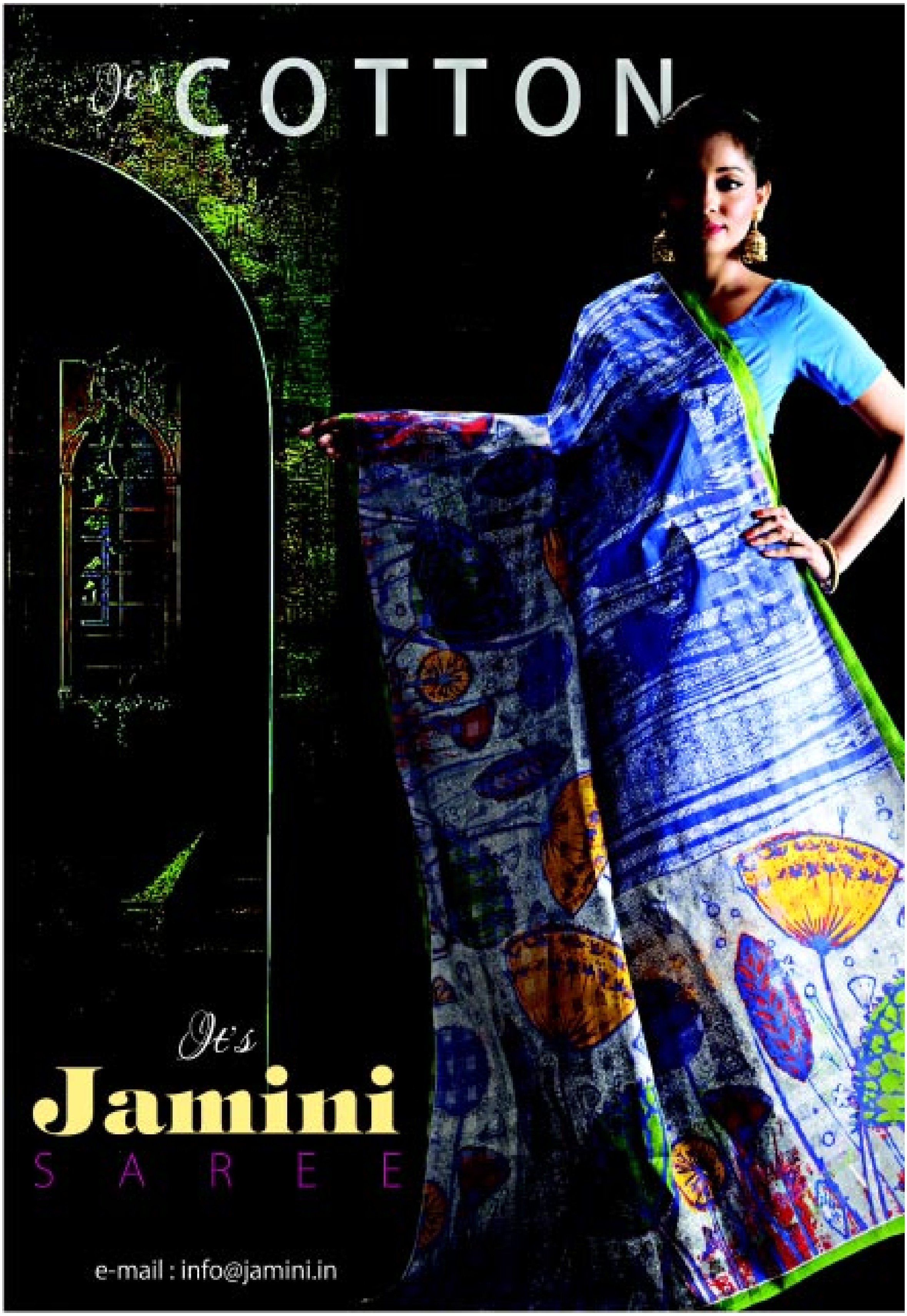
It's COTTON
It's
Jamini
SAREE
e-mail : info@jamini.in

SKIPPER
CPVC Pipes
made from
Durastream™
CPVC COMPOUND
FIXED FOR LIFE
NSF
pw
MADE WITH JAPANESE COMPOUND
CPVC Pipes & Fittings
Ideal for Hot & Cold Water Plumbing
LEAD FREE
Call: 9830037144 mail: pvc@skipperlimited.com
www.skipperlimited.com

Forest Friendly Company

# WE ARE 60 YEARS YOUNG...
## AND STILL LOOKING FOR MORE THINGS TO DO

Since our birth in 1957, we have looked at new products to make life easier and better for our customers. Along the way we have innovated and produced newer, stronger and better products which have set the standards for the industry, thus gained the trust of thousands of loyal customers.

Today on the threshold of our 60th birthday, we have still not lost the childlike enthusiasm that has made us what we are today.

DURO™ 60

THE SPIRIT OF DUROBILITY

PLYWOOD | BLOCK BOARD | DOORS | VENEERS | LVL

*With Best Compliments of :*

MAKAIBARI TEA
&
TRADING
COMPANY
PRIVATE LIMITED

Regd. Off. : Kishore Bhavan,
17, R. N. Mukherjee Road,
Kolkata - 700 001

*With*
*Best*
*Compliments*
*from :-*

**SWITZ FOODS**
**PRIVATE LIMITED**

শারদীয়ার
প্রীতি-শুভেচ্ছা
ও ভালোবাসা...
জনৈক শুভানুধ্যায়ী
(MR)

RAL
Global brands. Built on trust.
আপনার উদ্দীপনায়
পাওয়ার সংযোগ করুন
আপনার অনিন্দ্য কর্পোরেট ভাবমূর্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে
আমাদের পাওয়ার-প্যাকড্ পণ্যের শৃঙ্খলা থেকে বেছে নিন।
mitva
সোলার রেঞ্জ
NIPPO
Purple Turtle
Nuby
pigeon
পোর্টেবল এনার্জী
চাইল্ড কেয়ার রেঞ্জ
+91-11-4050 0800 / 4050 0900 / 1800-1038-222
+91-11-4170 4942
info@ral.co.in
www.ralindia.co.in

চিরায়ত সাজে
চিরনতুন সঙ্গমে
নজরকাড়া রঙ
জমাট বুনন
অনন্য ডিজাইন
উৎকর্ষে সেরা
Sangam TM
SHATABDI
Sangam TM
Cotton Sarees & Suits
SANGAM TRADERS
201B, M. G. Road
Kolkata 700 007
Ph. - 033-22696744

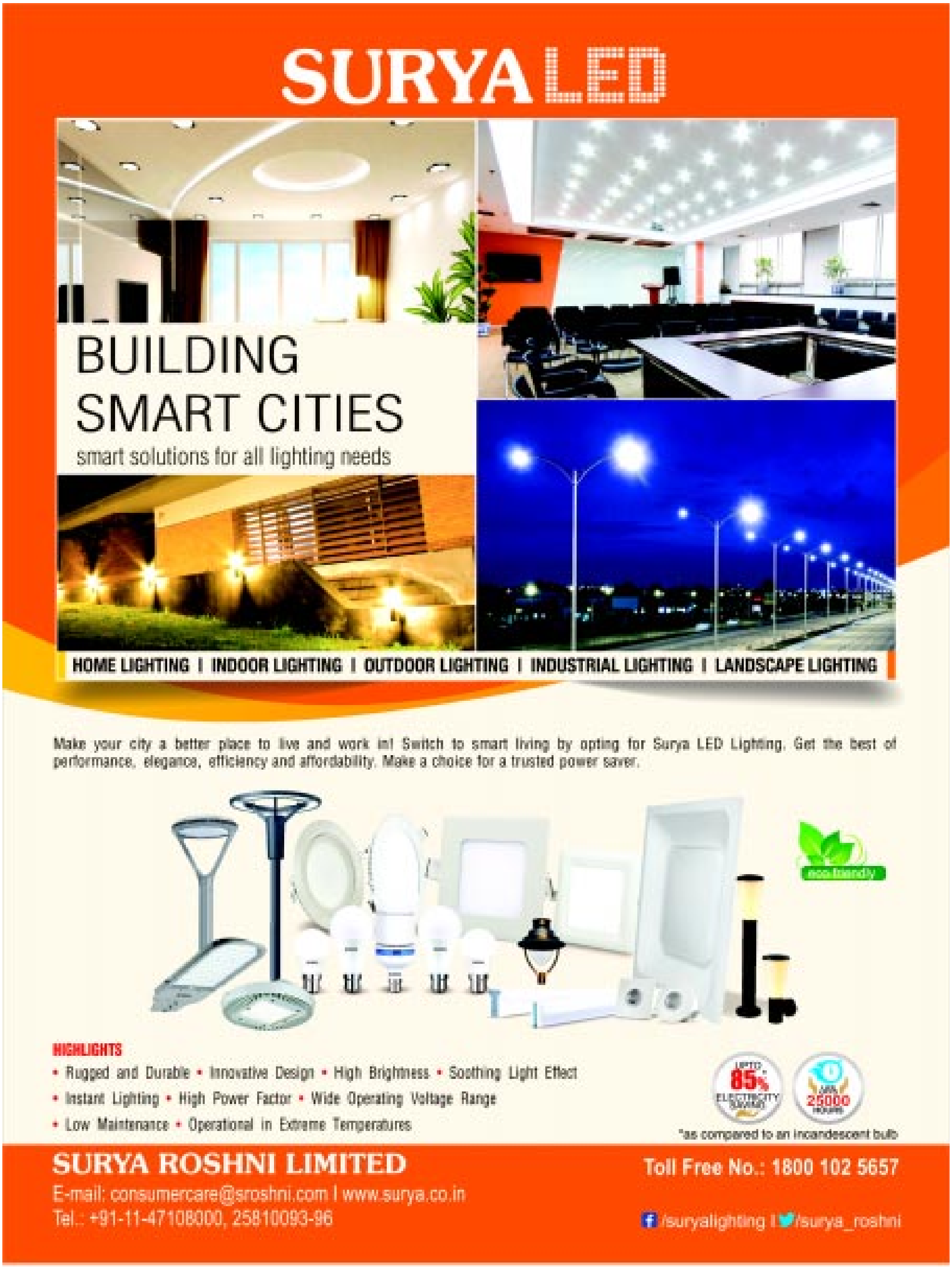
SURYA LED
BUILDING
SMART CITIES
smart solutions for all lighting needs
HOME LIGHTING I INDOOR LIGHTING I OUTDOOR LIGHTING I INDUSTRIAL LIGHTING I LANDSCAPE LIGHTING
Make your city a better place to live and work in! Switch to smart living by opting for Surya LED Lighting. Get the best of performance, elegance, efficiency and affordability. Make a choice for a trusted power saver.
eco-friendly
HIGHLIGHTS
• Rugged and Durable • Innovative Design • High Brightness • Soothing Light Effect
• Instant Lighting • High Power Factor • Wide Operating Voltage Range
• Low Maintenance • Operational in Extreme Temperatures
85%
25000
*as compared to an incandescent bulb
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni

JANAK
SURVEYING INSTRUMENT
TOTAL STATIONS
CONSTRUCTION LASERS
GIS/GPS HANDHELDS
GNSS REFERENCE STATIONS
CONSTRUCTION LASERS
GPS/GNSS SURVEYING SYSTEMS
LASER DISTANCE METER
LEVELS
SURVEYING ACCESSORIES
THEODOLITES
JANAK POSITIONING & SURVEYING SYSTEMS (PVT) LTD.
304-B, Pal Mohan Plaza, 11/56,D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi- 1100
Mobile: 9818108317, 9810738317, 9873145755
Tel : 011-23515400, 23515399, 23617190
B-28, Sector - 4, Noida
Tel : 120 4221720, 4221820, 2544445
Email : janakji@janaksurvey.in , janak.ji@yahoo.com
Website : www.janaksurvey.com

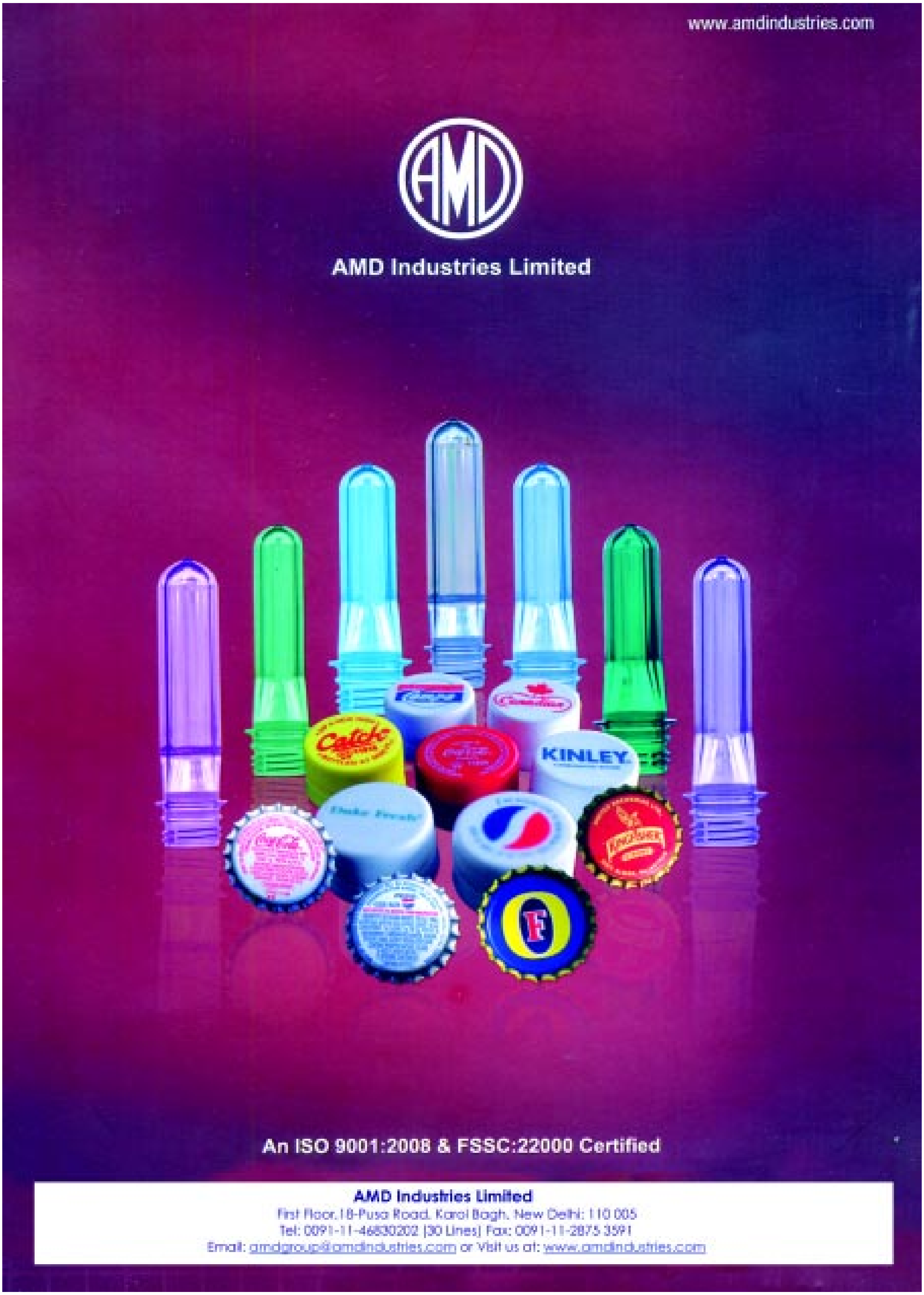
www.amdindustries.com
AMD
AMD Industries Limited
KINLEY
An ISO 9001:2008 & FSSC:22000 Certified
AMD Industries Limited
First Floor, 18-Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi: 110 005
Tel: 0091-11-46830202 (30 Lines) Fax: 0091-11-2875 3591
Email: amdgroup@amdindustries.com or Visit us at: www.amdindustries.com

# স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৬ সংখ্যা,
১ আশ্বিন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
১৮ সেপ্টেম্বর - ২০১৭,
যুগাব্দ - ৫১১৯,
Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**
**সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল**
**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়**
**রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**
**হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর :**
**৮৬৯৭৭৩৫২১৪**
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ৭০ টাকা**
**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


দেবীপ্রসঙ্গ
পূজার ভাবনা
ড. সীতানাথ গোস্বামী — ১৯


## উপন্যাস


বিপরিণাম

শেখর সেনগুপ্ত — ৬৮

চিরন্তন কাহিনি

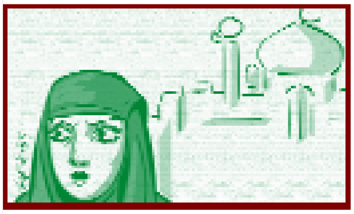

সুমিত্রা ঘোষ — ১৩২

উপন্যাসোপম কাহিনি / সম্ভবামি

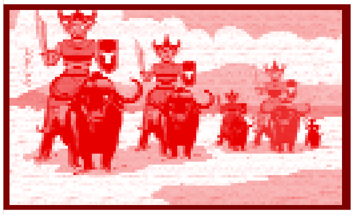

প্রবাল চক্রবর্তী — ২১৬

গল্প / কাকলি

রমানাথ রায় — ৫৫


## গল্প


মোক্ষম চাল

শেখর বসু — ৬১

তদন্ত

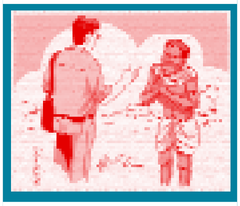

এষা দে — ১০৩

না বলা বাণী

গোপাল চক্রবর্তী — ১৯৫

অ্যাকুরিয়াম

সন্দীপ চক্রবর্তী — ২৫৩

ডাব বাবা

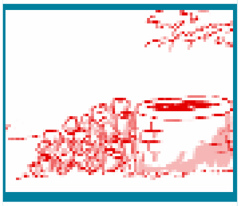

সিদ্ধার্থ সিংহ — ২৬৫

রাজ-ভাগ্য

বিরাজ নারায়ণ রায় — ২৭১

# প্রবন্ধ


রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের নিত্য শাখা সমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছে

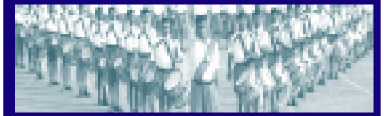

এম জি বৈদ্য — ২১

ব্যতিক্রমী ইসলামি বিশ্ব নজরুলের ভারত

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস — ২৭

নিবেদিতা-অরবিন্দ : ঝড়ের পাখি

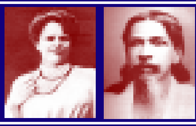

রন্তিদেব সেনগুপ্ত — ৩৫

স্বাধীন ভারতের সত্তর বছর জাতীয় রাষ্ট্রের অসম্পূর্ণতা

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — ৪৯

সনাতন ধর্মে প্রীতি ও ভারতভক্তি সমার্থক

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ — ১১৫

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থা কীরকম হওয়া বাঞ্ছনীয়

অমলেশ মিশ্র — ১১৯

মেগাস্থিনিসের 'ভারত' প্রাচীন আর্যসভ্যতা ও কিছু বিশ্লেষণ

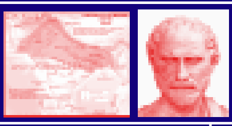

রজত পাল — ১২৩

হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি অনিবার্য হয়ে উঠছে কেন?

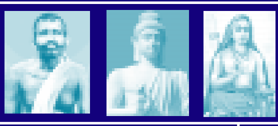

দেবীপ্রসাদ রায় — ১৬৩

শ্রীনারায়ণ গুরু এবং হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন

রবি রঞ্জন সেন — ১৬৭

ভারতবন্ধু বিদেশিরা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০৫

রবীন্দ্রনাথ ও কবি দিকশূন্য ভট্টাচার্য

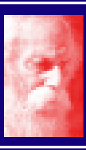

অর্ণব নাগ — ২১১

তন্ত্রে জ্যমিতি

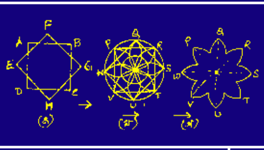

সৌমেন নিয়োগী — ২৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাইরে

জহর মুখোপাধ্যায় — ২৫৯

## পুরাণ কথা

বিশ্বের প্রথম ধারাভাষ্যকার

বিজয় আঢ্য — ১৮৫

## রম্যরচনা

পুজোয় পরুন পুরনো জুতো

সুন্দর মৌলিক — ১৭৫

## ছোটদের পাতা

শব্দরূপ : শান্তনু গুড়িয়া - ২৭৯ অঙ্কে ধাঁধা : শৌনক রায়চৌধুরী - ২৭৯

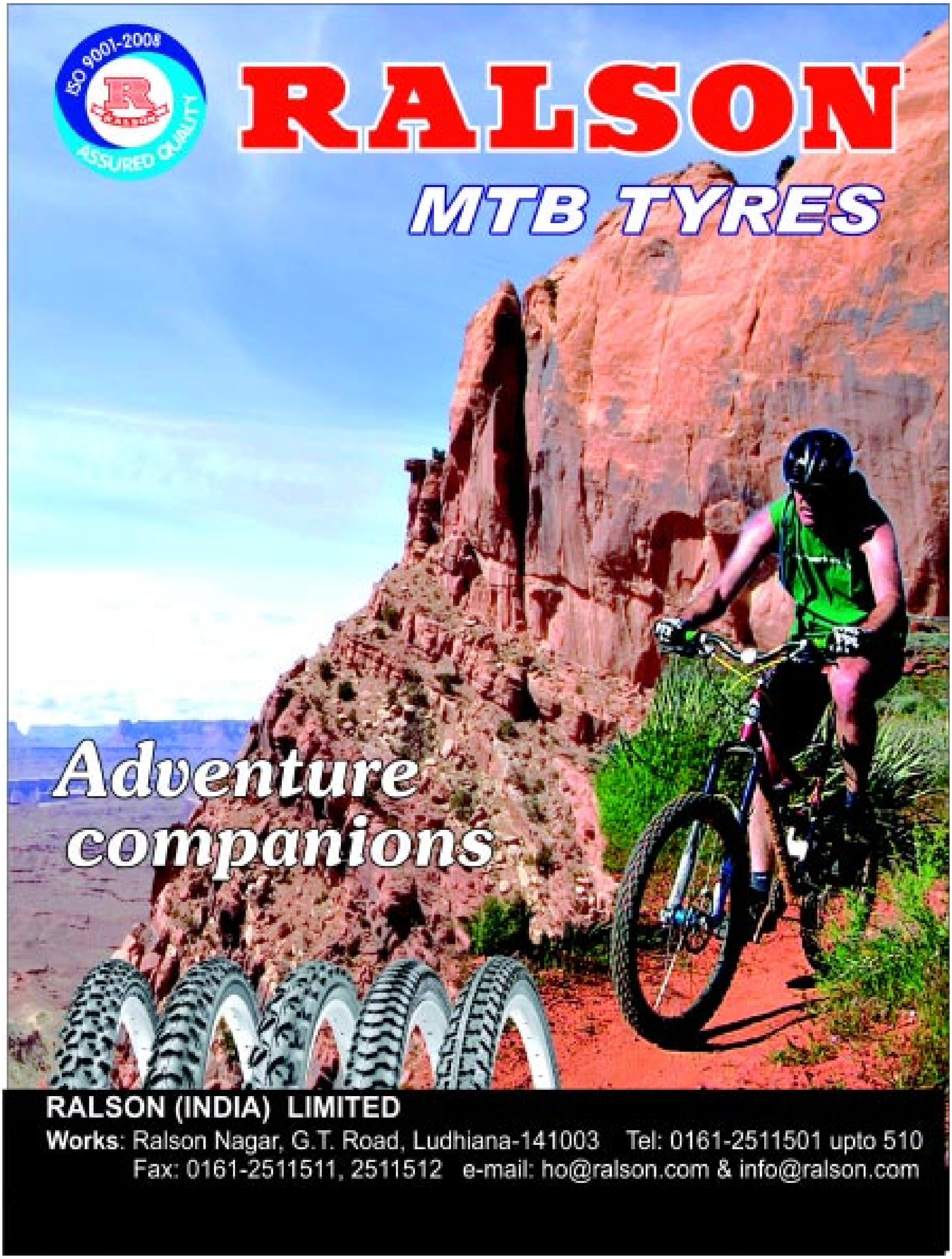
ISO 9001-2008
ASSURED QUALITY
RALSON
MTB TYRES
Adventure companions
RALSON (INDIA) LIMITED
Works: Ralson Nagar, G.T. Road, Ludhiana-141003 Tel: 0161-2511501 upto 510
Fax: 0161-2511511, 2511512 e-mail: ho@ralson.com & info@ralson.com

*"দিগ্‌ভুজা— নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দণী—*
*বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী— দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—*
*বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞান দায়িনী— সঙ্গে বলরূপী*
*কার্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধি রূপী গণেশ;*
*এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"*

*(আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র)*

# পূজার ভাবনা

ড. সীতানাথ গোস্বামী

পূজা-অর্চনা আমরা প্রায় সকলেই করে থাকি— কেউ নিয়মিত, কেউ মাঝে মধ্যে, কেউ বিভিন্ন উপাচারে, কেউ বা কেবল গন্ধপুষ্পে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, আমরা প্রতিমাকে পূজা করি না কিন্তু পূজা করি প্রতিমা দ্বারা অভিব্যক্ত দেবতাকে বা পরমেশ্বরকে। সকল পূজাই বস্তুত এক পরমেশ্বরের পূজা এবং সকল দেবতাই তো পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন। এবিষয়ে স্বয়ং অপৌরুষেয় বেদই প্রমাণ; ঋগ্‌বেদের অস্যবামীয় সূক্ত (১।১৬৪) ৪৬ সংখ্যক মন্ত্রে আছে— 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ'। এর অর্থ— এক চিরন্তন সত্য পদার্থই আছেন। তাঁকেই পণ্ডিতগণ অগ্নি, যম, বায়ু বা মাতরিশ্বা ইত্যাদি নানা নামে বলে থাকেন। তিনি সৎ বা চিরন্তন সত্য বললেই তাঁকে চিৎ বা প্রকাশরূপ বলতেই হবে, অন্যথা তিনি অপ্রকাশিত থাকলে তাঁকে জানাই যাবে না। আবার যিনি প্রকাশমান বা চিৎ তিনি আনন্দস্বরূপ অবশ্য

হবেন। যেহেতু চিৎ বা চৈতন্য বা জ্ঞানের স্বভাবই হল যে জ্ঞান হওয়ামাত্র আনন্দ হয়ে থাকে। তাই সেই পরমেশ্বর হলেন সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ।

পূজাতে উপাসক বা পূজক উপাস্য পরমেশ্বরেরই চিন্তা করবেন, এটাই সকল শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ। উপাস্যের চিন্তা বা ভাবনাই তো উপাসনা। উপাসনা শব্দের অর্থও তো তাই। উপ আস যুচ প্রত্যয় করে উপাসনা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ উপাস্যের সমীপে (উপ) আসনা বা অবস্থান। এই অবস্থান তো আর শারীরিকভাবে সম্ভব নয়, তাই মানসিকভাবে দেবতার সন্নিধিতে থাকতে হবে অর্থাৎ উপাসক চিন্তা করবেন যে, তিনি তাঁর কাছেই অবস্থান করছেন; যে পূজক এমন চিন্তা করতে পারেন বা করার অভ্যাস করেন তিনি যথেষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তি পান, একথা যে কোনো অনুভবী ব্যক্তি স্বীকার করবেন।

ভাবনা বা চিন্তার অসাধারণ সামর্থ্য সকল শাস্ত্রেই বলা আছে এবং প্রকৃতিতে তার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথাটা প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু দেবতা চিন্তার দ্বারা দেবতাভাব প্রাপ্তি বা পরমেশ্বরের চিন্তার দ্বারা পরমেশ্বরভাব প্রাপ্তি তো সহজে হবে না। সুদীর্ঘকালের সাধনার দ্বারাই তা সম্ভব। কিন্তু কতকাল এবং কত গভীর ভাবে চিন্তা করলে ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্তি হতে পারে তা দৃষ্টান্তসহিত দেখাতে না পারলে বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সৌভাগ্য না হলে এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে জীবজগতের দৃষ্টান্ত দিতে হয়। আরশোলা তো আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার জীব। কাঁচপোকাও আমরা বেশিরভাগ লোকেই দেখেছি। আরশোলা কাঁচপোকাকে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়। আরশোলার বাসার মুখে কাঁচপোকা দাঁড়িয়ে থাকে এবং আরশোলা প্রতিক্ষণে সেই কাঁচপোকার চিন্তা করে— ওরে বাবা, কাঁচপোকা! ওরে বাবা কাঁচপোকা! এমন চিন্তা করতে করতে আরশোলা কাঁচপোকায় রূপান্তরিত হয়। এই কথা ভাগবতে নারদও বলেছেন—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুজায়াং তমনুস্মরণ্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্।। (৭।১।২৭)

কুজো বা দেওয়ালের মধ্যে আরশোলার বা তেলেপোকার গর্তে আবদ্ধ থেকে বিদ্বেষের ও ভয়ের বশীভূত হয়ে সর্বদা তাকে চিন্তা করতে করতে তার স্বরূপই লাভ করে। ঘনীভূত চিন্তার ফলেই এমনটি ঘটে। মানুষও যদি ভগবানকে প্রেমবশতঃ অনবরত চিন্তা করে তবে সেও ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে নারদ অনেক কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সংক্ষেপ করতে তা আর এখানে বলা সম্ভব হল না। ভাগবদ্‌চিন্তার এমন গভীরতা প্রেম বা ভক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়। তবুও আমাদের মতো মানুষের জন্য স্বয়ং ভগবান আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ভগবানকে মানুষ সামান্য যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু দেবে তা তিনি গ্রহণ করবেন, যদি তা ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত হয়। এবিষয়ে গীতাতে ও ভাগবতে আমরা একটিই শ্লোক অবিকৃতভাবে পাই যা খুব কদাচিৎই দেখা যায়। শ্লোকটি হল—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

*(গীতা, ৯।২৬, ভাগবত ১০।৮১।৪)*

কৃষ্ণের বাল্যবন্ধু সুদামা অনেকদিন পরে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় রিক্তহস্তে যাওয়া সঙ্গত নয় বলে একটি কাপড়ের মধ্যে কয়েকমুঠো চিড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু সাক্ষাতের পর সেই সামান্য বস্তু তাঁর পক্ষে লজ্জায় বের করা সম্ভব হচ্ছিল না। কৃষ্ণ নিজেই বললেন, দেখি বন্ধু, কী এনেছ আমার জন্য। এই বলে নিজেই চিড়ের পোঁটলা খুলে একমুঠো খেয়ে অত্যন্ত তৃপ্ত হলেন। কারণ তাঁর বন্ধু তাঁর জন্য ভক্তিপূর্বক ঐ সামান্য বস্তু নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সীমিত সামর্থ্যে। সুদামা লজ্জিত হলেন তাঁর আনীত বস্তুর অকিঞ্চিৎকরত্বের জন্য। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও গীতার্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে এমন সময়ে অর্থাৎ ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ নবম অধ্যায়ের সমাপ্তিতে গ্রন্থের সারস্বরূপে কতগুলি কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে এটি অন্যতম। আমাদের পূজার সময়েও নৈবেদ্যাদির অর্পণকালে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি নিয়ে প্রদান করা কর্তব্য। তাতেই ভগবান প্রীত হন।

পূজা-অর্চনার সময়ে উপাসকের মনোভাব কেমন হবে তার দিগ্‌দর্শন রয়েছে মহানির্বাণতন্ত্রে। পূজার সময়ে পূজক বা উপাসক সর্বদা উপাস্যের চিন্তা করতে করতে উপাস্যস্বরূপ হয়ে যেতে পারলে তা হল আদর্শ। তা যদি না পারেন তবে দীর্ঘকাল প্রলম্বিত ধ্যান করা যেতে পারে। তা হল মধ্যমাবস্থা। তাও যদি করা সম্ভব না হয় তবে উপাস্যের স্তুতি, জপ ইত্যাদি করলেও মন অনেকটাই সংযত হয়। তবে জপাদির ও স্তবপাঠের সময়ে স্তবাদির অর্থ জানা অত্যন্ত আবশ্যক। এটি হল মহানির্বাণতন্ত্রের ভাষায় তৃতীয় ভাব বা অধম ভাব। এটুকুও করতে না পারলে অন্তত গন্ধপুষ্পাদির সাহায্যে বাহ্যপূজা, যাকে এই তন্ত্র অধমাধম ভাব বলেছেন তাও করা যেতে পারে। কিন্তু নিজে উপার্জন করে বা নিজে উৎপাদন করে নিজে ও নিজের পরিবার তথা পরিজনের ভোগেই লাগানো অত্যন্ত অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের স্পষ্ট সমুদ্‌ঘোষ— যা কিছু কাজ কর, যা কিছু আহার কর, যা আহুতি দাও, যা দান কর, যেটুকু তপস্যা কর তার সবই আমাকে অর্পণ কর। এবার মহানির্বাণতন্ত্রের ও গীতার শ্লোকদুটি বলছি—

উত্তমো ব্রহ্মমদ্‌ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বাহ্যপূজাহধমাধমা।।

*(মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১২২)*

এবং

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।

*(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৯।২৭)*

# রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিত্য শাখা সমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছে

এম জি বৈদ্য

বহু মানুষই একথা জানেন না যে, ডা: হেডগেওয়ার কে ছিলেন এবং তিনি কেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার নাগপুর নিবাসী ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর মনে হয়েছিল, আমাদের দেশে ইংরেজদের শাসন থাকা ঠিক নয়। তাঁর যখন দশ-এগারো বছর বয়স আর তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন ইংল্যান্ডের রানি তথা ভারতবর্ষের মহারানি ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছিল। এই উপলক্ষে সমস্ত স্কুলে মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা মহানন্দে সেই মিষ্টি খাচ্ছিল, কিন্তু কেশব হেডগেওয়ার সেই মিষ্টি ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

**বন্দে মাতরম্ ধ্বনি**

দশ-এগারো বছর বয়সের কেশবের এই স্বভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি যখন দশমশ্রেণীর ছাত্র, সেসময় 'বন্দে মাতরম্' বলা অপরাধ ছিল। নীলসিটি হাইস্কুলে ইন্সপেক্টর আসার কথা। কেশবের মনে হলো ইন্সপেক্টর মহোদয়কে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে স্বাগত করা দরকার। তিনি দশমশ্রেণীর ছাত্রদের এবিষয়ে বললে সবাই রাজি হয়ে যায়। ইন্সপেক্টর সাহেব প্রথমে দশম শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন। পূর্বপরিকল্পনা মতো সবাই বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানায়। ইন্সপেক্টর সাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। ঘর থেকে বেরিয়ে পরের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলে

সেখানেও তাঁকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে স্বাগত জানানো হয়। তিনি প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দেন এই ঘটনার নাটের গুরুকে যেন কড়া শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো ছাত্র প্রধানশিক্ষককে কেশবের নাম বলেনি। শাস্তিস্বরূপ দশমশ্রেণীর সব ছাত্রের অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রায় একমাস দশমশ্রেণীর ছাত্রদের ক্লাস বন্ধ। অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, 'ছাত্রদের লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।' কিন্তু কোনো ছাত্রই ক্ষমা চাইতে রাজি ছিল না। অগত্যা এক রাস্তা বের করা হলো যে, প্রধান শিক্ষক যখন এক একজনকে জিজ্ঞেস করবেন— 'তোমরা সবাই মিলে দোষ করেছ' তখন ছাত্রদের 'হ্যাঁ' অর্থাৎ সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে হবে। এভাবে সব ছাত্রই মাথা নেড়ে অপরাধ স্বীকার করে ক্লাসে পুনঃপ্রবেশ করে। কিন্তু এর মধ্যে একমাত্র কেশব হেডগেওয়ার 'হ্যাঁ'সূচক মাথা না নাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

**যবতমল ও পুণে**

সেই সময় তপস্বী বাবাসাহেব পরাঞ্জপে যবতমলে এক স্কুল শুরু করেছিলেন। ডা: মুঞ্জের পত্র নিয়ে কেশব সেই স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু ইংরেজদের রোষানলে সেই স্কুলও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কেশব কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পুণা যান। সেখানে কলকাতার রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের একটি স্কুলে ভর্তি হন। প্রায় দুমাস তিনি পুণায় থাকেন এবং পরে অমরাবতী থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দেন ও পাশ করেন। তাঁর শংসাপত্রে প্রখ্যাত বিপ্লবী ড. রাসবিহারী ঘোষের হস্তাক্ষর ছিল।

**বিপ্লবীদের কেন্দ্রস্থলে**

বিপ্লবীদের কাজকর্মের প্রতি কেশব হেডগেওয়ারের আকর্ষণ ছিল। তাঁর নিজেরও একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী নাগপুরে ছিল। তখন বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। সেজন্য ডাক্তারি পড়ার জন্য তিনি কলকাতাকেই বেছে নিলেন। অল্পকালের মধ্যেই বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ১৯১০ সালে কলকাতায় আসেন। ১৯১৪ সালে এল এম অ্যান্ড এস ডিগ্রি পান এবং নিয়মানুযায়ী হাউস স্টাফের জন্য আরও এক বছর কলকাতায় থাকেন। ১৯১৬ সালের গোড়ায় তিনি নাগপুরে ফিরে যান।

**কংগ্রেসের মধ্যে**

বিপ্লবীদের দলে সক্রিয়ভাবে কাজ করেও তাঁর মনে হয়েছিল যে, দু-চারজন ইংরেজকে মেরে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না। সর্বসাধারণ মানুষের মনে দেশের স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাগ্রত না হলে যত বিপ্লবীই শহিদ হোন না কেন, দেশ স্বাধীন হতে পারে না। তাই তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম ছেড়ে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তখন লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন। স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা লাভ করবই— তাঁর এই ঘোষণায় দেশের ছাত্র-যুবা উৎসাহিত হয়। সেসময় ডাক্তার হেডগেওয়ার যুবকদের উৎসাহিত করতে উত্তেজক ভাষণ দিতেন। ইংরেজ সরকার তাঁর ভাষণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাতে ডাক্তারজীকে দমানো না গেলে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ডাক্তারজী যে ভাষণ দেন, তা পূর্বের ভাষণের চেয়ে বেশি উত্তেজনাপূর্ণ হওয়ায় ১৯২১ সালের ১৯ আগস্ট তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯২২ সালের ১২ জুলাই তিনি জেল থেকে মুক্ত হন। সেদিন প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য প্রকাশ্য স্থানে তাঁর অভিনন্দনসভা না করে বেঙ্কটেশ থিয়েটার হলে করা হয়। সেখানে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু ও হাকিম আজমল খানের মতো কংগ্রেসের অখিল ভারতীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

১৯২০ সালের ১ আগস্ট লোকমান্য তিলকের স্বর্গবাসের পর কংগ্রেসের রাশ গান্ধীজীর হাতে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কিস্থানের কামাল পাশার খলিফা পদ বাতিল করায় বিশ্বের মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন গান্ধীজীর মনে হয়েছিল যে কংগ্রেসের আন্দোলনকে পুষ্ট করতে মুসলমানদের এই রোষকে সমর্থন করা উচিত। তাই তিনি ভারতে খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। এতে কিছু কট্টর মুসলমান কংগ্রেসে আসে, কিন্তু খিলাফত আন্দোলন সফল হয়নি। মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের বদলে প্রতিবেশী হিন্দুদের ওপরই আক্রমণ করে বসল। মালাবারের মোপলা আক্রমণ এরই একটি উদাহরণ। সেখানে মুসলমানরা অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করল। বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে। অসংখ্য হিন্দু নারীর সম্ভ্রম লুঠ হলো।

**নতুন ভাবনার প্রকাশ**

খিলাফত আন্দোলনের বিষয়ে ডাক্তার হেডগেওয়ার গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর কথায় কোনো আমল দেননি। ডাক্তারজী জানতেন এই হিন্দুরাষ্ট্রের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ হিন্দু সমাজের হাতেই রয়েছে। হিন্দু সমাজ সংগঠিত না হলে এই দেশের ভাগ্যোদয় হবে না। সেজন্য তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, হিন্দুদের সংগঠন প্রয়োজন। এই ভাবনায় ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু ডাক্তার হেডগেওয়ার ১০ থেকে ১৪ বছরের কিশোর বালকদের নিয়ে নিত্য শাখা শুরু করলেন। এই কার্যপদ্ধতিই অসাধ্য সাধন করেছে। হিন্দুদের মধ্যে বহুপ্রকার ভেদাভেদ রয়েছে এবং আজও যেমন জাত-পাত, ভাষাভেদ, প্রদেশভেদ, তার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার মতো মারাত্মক ভেদভাবও রয়েছে। সঙ্ঘে নিত্য শাখার কারণে

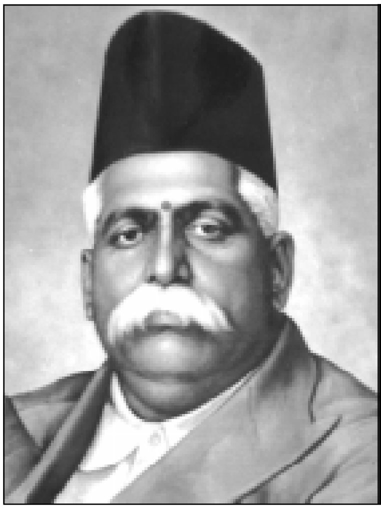

*ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার*

*মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর*

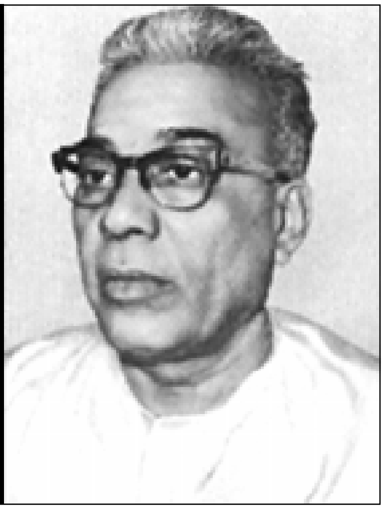

*বালাসাহেব দেওরস*

স্বয়ংসেবকরা এই সমস্ত ভেদাভেদ নির্মূল করে চলেছে। বিভিন্ন ভেদাভেদ রেখার ওপর ডাক্তার হেডগেওয়ার হিন্দু নামক একটি বড় রেখা টেনে দিয়েছেন।

**এক অনুভব**

১৯৩২ সালের কথা। সঙ্ঘের শীতকালীন শিবিরে সমাজে যাঁদের অচ্ছুত মনে করা হয় এমন ৮-১০ জন স্বয়ংসেবক এসেছিলেন। কয়েকজন গোঁড়া নতুন স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীকে বলেন, 'আমরা এদের সঙ্গে বসে ভোজন করতে পারব না।' ডাক্তারজী তাদের বললেন, আপনারা আলাদা বসে খেতে পারেন, কিন্তু আমি এদের সঙ্গে বসেই ভোজন করব। ১০-১২ জন নতুন স্বয়ংসেবক আলাদা বসে ভোজন করে আর ডাক্তারজী সবার সঙ্গে বসে ভোজন করেন। এই দেখে ওই নতুন স্বয়ংসেবকরা পরদিন থেকে সবার সঙ্গে বসে ভোজন করা শুরু করে। সঙ্ঘের মধ্যে লোকদেখানো সহভোজের আয়োজন করা হয় না, কিন্তু আমরা সবাই এক— এই সংস্কারের ফলে জাতিভেদের মতো ব্যাধি স্বয়ংসেবকরা নির্মূল করে ফেলেছে।

**গুরুদক্ষিণা**

গুরুদক্ষিণার মতো এক অপূর্ব পদ্ধতি, যা ডা: হেডগেওয়ার সঙ্ঘের মধ্যে প্রচলন করেছেন। সঙ্ঘ নিশ্চিত করেছে যে, কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করা হবে না। সঙ্ঘে প্রবেশের জন্য কোনো ফি-র প্রয়োজন নেই। বছরে একবার স্বয়ংসেবকদের গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। এই গুরু কোনো ব্যক্তি নয়; ত্যাগ, পবিত্রতা ও পরাক্রমের প্রতীক গৈরিক পতাকাই গুরু। গুরু পূর্ণিমা তিথিতে গৈরিক পতাকাকে পূজা করে দক্ষিণা সমর্পণ করতে হয়। সঙ্ঘে কোনো ব্যক্তিই গুরুর সমান নন। সমর্পণ ভাবনায় গুরুদক্ষিণা অর্পণের ফলে সঙ্ঘে আরও একটি লাভ হয়েছে। সঙ্ঘ আত্মনির্ভর ও স্বাধীন থেকে গেছে। আজ লক্ষ টাকা গুরুদক্ষিণা দেওয়া স্বয়ংসেবকের বিষয়ে কেউ কিছু জানতেই পারে না। ১৯৪৬ সালে নাগপুরে সঙ্ঘের নিজস্ব কার্যালয় হয়েছে। তার আগে ভাড়া ঘরে কার্যালয় চলত। সারা ভারতে সঙ্ঘের বিস্তারের জন্য ডাক্তারজী ভালো ভালো পরিবারের যুবকদের অন্য রাজ্যে পড়াশুনা করে শাখা বিস্তারের জন্য পাঠাতেন। রাজভাউ পাতুরকরকে কলেজে পড়ার জন্য লাহোরে পাঠান। এভাবেই ওয়ার্ধার বাবা কল্যাণীকে শিয়ালকোটের রাওয়ালপিণ্ডিতে, পওনারের মুঞ্জেকে পঞ্জাবে এবং ভাইয়াজী দানীকে বারাণসীতে পাঠান। ভাউরাও দেওরস নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করার পর কমার্সের ডিগ্রি নেওয়ার জন্য লখনউ যান। সেখান থেকে বি-কম এবং এল-এল-বি ডিগ্রি লাভ করেন। এঁরা সবাই পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের শাখা বিস্তারের কাজ করতেন। ভাউরাও দেওরস এমনই যোগ্য ছিলেন যে, তিনি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও অটলবিহারী বাজপেয়ীকে স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা হিসাবে নির্মাণ করেন।

১৯৪০ সালের ২১ জুন ডাক্তারজীর দেহাবসান হয়। সেবছর তিনি ভীষণ অসুস্থ থাকায় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে আসতে পারেননি। তিনি শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের একবার শুধু দেখতে চাইলে ৯ জুন দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে তাঁকে আনা হয়। তখন তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আজ আমি আমার সামনে 'ছোট ভারত' দেখতে পাচ্ছি।' অসম বাদে বাকি সব রাজ্যে তখন সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়েছে। ১৯৪০ সালের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে ভারতের সমস্ত রাজ্য থেকে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকরা এসেছিলেন।

**সংস্কৃত প্রার্থনা**

দেশব্যাপী সঙ্ঘের বিস্তারের কল্পনা ডাক্তারজীর ছিল। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সঙ্ঘের প্রার্থনা মরাঠি ও হিন্দিতে ছিল। শাখার আজ্ঞাও এরকমই ছিল। ১৯৩৯ সালে নাগপুরের পাশে সিন্ধি গ্রামে সঙ্ঘের প্রথমসারির কার্যকর্তারা ১০ দিনের এক বৈঠকে বসেন। বৈঠকে

ডাক্তারজীর সঙ্গে শ্রীগুরুজী, আপ্পাজী যোশী, বালাসাহেব দেওরসের মতো সাত-আট জন ছিলেন। সেই বৈঠকে প্রার্থনা এবং আজ্ঞা সংস্কৃত ভাষায় হবে বলে স্থির হয়। ডাক্তার হেডগেওয়ার প্রার্থনার ভাব লিখে দেন। নাগপুরের নরহরিনারায়ণ ভিড়ে তা সংস্কৃতে ছন্দোবদ্ধ করেন।

**সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী**

ডাক্তারজীর ইচ্ছানুসারে তাঁর দেহাবসানের পর মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) সরসঙ্ঘচালক হন। মৃত্যুর একদিন আগে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ২০ জুন ডাক্তারজী শ্রীগুরুজীকে বলেন, এরপর আপনাকেই সঙ্ঘের দায়িত্ব নিতে হবে। সেদিন ডাক্তারজীর লাম্বার পাংকচার হওয়ার কথা। ঘরে তখন কৃষ্ণরাও মোহরীল ও যাদবরাও যোশী ছিলেন। তাঁরা সবাইকে একথা বলেন। ডাক্তারজীর মৃত্যুর ত্রয়োদশ দিবস অর্থাৎ ৩ জুলাই ১৯৪০, আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বয়ংসেবকদের সামনে বিদর্ভ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বাবাসাহেব পাধ্যে সরসঙ্ঘচালকরূপে মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের নাম ঘোষণা করেন। শ্রীগুরুজী ৩৩ বছর ধরে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেন।

**১৯৪২-এর আন্দোলন**

এই ৩৩ বছরে সঙ্ঘ বিবিধক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৭ সালের আগে শ্রীগুরুজীকে দুটো কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম বিষয়, ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং দ্বিতীয় বিষয়, ভারত বিভাজন। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করার কথা ছিল ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এজন্য গান্ধীজী ইংরেজদের ছ-মাসের সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু আন্দোলনের কথা গুপ্তচর মারফত ইংরেজরা জেনে যায়। তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের গভর্নর ভাইসরয়কে গোপনে পত্র লিখে জানান যে, ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গান্ধীজী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বড় আন্দোলন সংঘটিত করতে চলেছেন এবং সেই সময় সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের সহায়তায় ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণ করবে। এই তথ্য ১৯৭২ সালে 'ট্রান্সফর অব পাওয়ার ১৯৪০' শীর্ষক পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত গোপনীয় পত্রাবলীর মধ্যে রয়েছে। ইংরেজ সরকার জেনে যায় যে, গান্ধীজী দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কংগ্রেসের সমস্ত বড় নেতার ৯ আগস্ট মুম্বাই পৌঁছনোর কথা ছিল। ইংরেজ সরকার ঠিক করে মুম্বাই পৌঁছলেই সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

**ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে সঙ্ঘ**

বড় বড় নেতাকে গ্রেপ্তার করায় জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে আর যে যেরকম ভাবে পারে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে এবং তাতে কোনোরকম যোগসূত্র ছিল না। একথা সত্য যে এই আন্দোলনে সঙ্ঘ সংগঠনাত্মক ভাবে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু স্বয়ংসেবকরা ব্যক্তিগত ভাবে সারা দেশের স্থানে স্থানে অংশগ্রহণ করে। শ্রীগুরুজীর তখন মনে হয়েছিল, সঙ্ঘের নিজের শক্তিতে আন্দোলন চালাবার মতো শক্তি এখনও হয়নি। এ সম্পর্কিত একটি কথা এখানে উল্লেখ্য, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সঙ্ঘের ভূমিকা বিষয়ে শ্রীগুরুজী দত্তোপন্ত ঠেংড়ীকে বলেন, 'সঙ্ঘের শক্তির বিষয়ে কিছু লোকের খুবই মনোরঞ্জক কল্পনা রয়েছে। সঙ্ঘের শক্তি কেবলমাত্র গোন্দিয়া থেকে বেলগাঁও পর্যন্ত সীমিত ছিল। অন্য রাজ্যে এত শক্তিশালী ছিল না। এছাড়া সঙ্ঘের প্রভাবযুক্ত অংশ দেশের মধ্যভাগে। ইংরেজরা চারিদিক ঘিরে ফেলে আন্দোলন শেষ করে দিতে পারে।'

এজন্য শ্রীগুরুজী স্বয়ংসেবকদের বলেন, গান্ধীজীর আন্দোলনে সর্বশক্তি দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং স্বয়ংসেবকরা এই আন্দোলনে আন্তরিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেসময় শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি দিল্লির সঙ্ঘচালক হংসরাজ গুপ্তার বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতেন। ওয়ার্ধার সঙ্ঘচালক পণ্ডিত সাতওলেকর তাঁর বাড়িতে নানা পাটিলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের অচ্যুতরাও পটবর্ধন, সেনাপতি বাপট, সানে গুরুজীর মতো নেতাদের সঙ্ঘের কার্যকর্তারা লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

**দেশভাগের আগে**

১৯৪৭ সালে সত্য হোক বা মিথ্যা, সঙ্ঘের মনে হয়েছিল দেশভাগের সিদ্ধান্ত গান্ধীজী কখনোই স্বীকার করবেন না। এই বিশ্বাসের একটি দৃঢ়ভিত্তি ছিল। মুখ্য কারণ ছিল, ১৯৪৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের স্লোগান ছিল অখণ্ড ভারত। অন্যদিকে মুসলিম লিগের দাবি ছিল পাকিস্তান। যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন সেখানে কংগ্রেস মেজরিটি পায়ই, কিন্তু ৯৫ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যাবহুল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যেও কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করে। পঞ্জাবেও মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সেখানে ইউনিয়নিস্ট পার্টির সরকার গঠিত হয়। সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লিগ সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে এলেও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। মুসলিম লিগ শুধু বঙ্গপ্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করে। সেই সময়ের পরিস্থিতিতে মনে হতো না যে, গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দেশ বিভাজন স্বীকার করে নেবে।

**গান্ধীজীর ওপর বিশ্বাস**

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীগুরুজী মুলতানে ছিলেন। মুলতানের জেলা সঙ্ঘচালক বলদেব বর্মন শ্রীগুরুজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'পাকিস্তানের পক্ষে খুব হইচই হচ্ছে, এটা সত্যি হবে না তো?' শ্রীগুরুজী বলেন, 'গান্ধীজীর ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তিনি পাকিস্তানের দাবি কখনো মেনে নেবেন না। হতে পারে, দেশ অখণ্ড রাখার জন্য জিন্নার কিছু প্রস্তাব (মুসলমান

তুষ্টিকরণ) তিনি মেনে নেবেন। কিন্তু দেশ বিভাজন তিনি কখনো হতে দেবেন না।' (রঙ্গাহরি : শ্রীগুরুজী জীবন চরিত্র, পৃঃ ১২৪)।

**ডাইরেক্ট অ্যাকশন**

পাকিস্তানের দাবির পক্ষে কংগ্রেসের ওপর চাপ বাড়ানোর জন্য জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানরা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' দিবস পালন করে। সেদিন কলকাতায় অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড নোয়াখালি, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশেও সংঘটিত হয়। হিন্দুরা এই পৈশাচিক নরসংহারের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বলে বাংলার হিন্দুদের এই অত্যাচার সহ্য করতে হয়। গান্ধীজী জিন্নাকে থামানোর জন্য গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে বলেন, নেহরুর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারকে বরখাস্ত করা হোক এবং জিন্নাকে তাঁর পছন্দমতো সরকার বানাতে দেওয়া হোক। কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজীর এই পরামর্শ অস্বীকার করেন। এর ফলে দেশ বিভাজনকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গান্ধীজীর কোনো উপায় ছিল না।

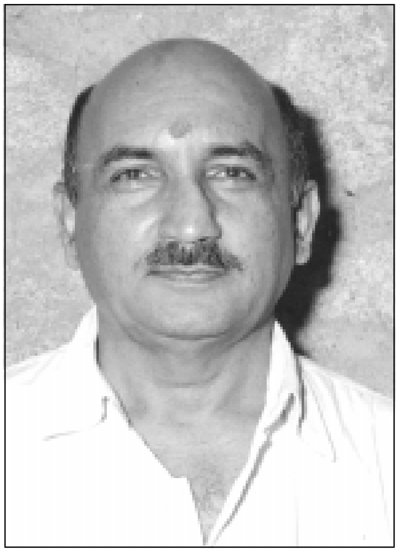

*যাদবরাও যোশী*

পঞ্জাবে মুসলমানবহুল শহরগুলিতে হিন্দুরা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের তীব্রভাবে মোকাবিলা করেন। নাগপুরের এক স্বয়ংসেবক ১৯৪৩ সালে মন্টোগামারী জেলায় প্রচারক ছিলেন। তিনি 'ভারতমাতার বিভাজন সঙ্কটে স্বয়ংসেবকদের পরাক্রম পর্ব' শীর্ষক এক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। পরিস্থিতি ক্রমশ দেশবিভাগের দিকে এগুচ্ছে স্বয়ংসেবকরা এটি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য পঞ্জাবের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সময়ের আগেই শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। বর্গে অংশগ্রহণকারী স্বয়ংসেবকদের গ্রামে গ্রামে পাঠানো হয়েছিল হিন্দুদের সাহস জোগাতে। মুসলমানদের পক্ষে পুলিশের সমর্থন ছিল। তবু স্বয়ংসেবকরা মুসলমান দুষ্কৃতীদের তীব্রভাবে মোকাবিলা করায় এই এলাকায় হিন্দুদের জীবনহানি কম হয়েছিল।

**দেশ বিভাজন স্বীকার**

শেষপর্যন্ত কংগ্রেস দেশবিভাজন স্বীকার করে নেয়। ১৯৪৭ সালের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গোবিন্দবল্লভ পন্থ ভারত বিভাজন স্বীকার করে প্রস্তাব পেশ করেন। রাজর্ষি পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেন। শ্রীট্যান্ডনের ভাষণের পর তাঁর সমর্থনে এত হাততালি পড়েছিল যে মনে হয় প্রস্তাব পাশ হতে পারবে না। কিন্তু গান্ধীজী বলে ফেলেন, এই প্রস্তাব পাশ হওয়া অনিবার্য। প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। বিভাজনের বিরুদ্ধে যাতে জনমত সংঘটিত করা না যায় তার জন্য দশ মাস আগে ২৫ আগস্ট বিভাজনের দিন ঠিক করা হয়। বিভাজনের অব্যবহিত পরেই পুলিশের সহায়তায় মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। পশ্চিম পঞ্জাব থেকে ট্রেনের বগি ভর্তি করে হিন্দুদের লাশ ভারতে পাঠানো হতে থাকে। সঙ্ঘ সর্বশক্তি দিয়ে বিপন্ন হিন্দুদের পাশে দাঁড়ায়। লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত মানুষ ভারতে পালিয়ে আসতে থাকে। তাদের সহায়তার জন পঞ্জাব রিলিফ কমিটি স্থাপিত হয়। পঞ্জাবের বহু কংগ্রেস নেতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের জন্যই তারা জান-মান নিয়ে ভারতে আসতে পেরেছেন।

বিপদের দিনে দেশবাসীর পাশে নিঃস্বার্থভাবে দাঁড়ানোর ফলে সঙ্ঘের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেড়ে যায়। সঙ্ঘ এত জনপ্রিয় হয় যে, ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নেতারা ভয় পেয়ে যান। উত্তরপ্রদেশের একজন সংসদীয় সচিব 'ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ' বই লিখে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে সওয়াল করেন। ১৯৪৮ সালের ২৯ জানুয়ারি 'জওহরলাল নেহরু সঙ্ঘকে সমূলে উৎপাটন' করার ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীর হত্যা হলে তারা একটা বড় সুযোগ পেয়ে যায়। গান্ধী হত্যায় কোনোভাবে যুক্ত না থাকলেও সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীকে ৩০২ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়, যেন তিনিই পিস্তল দিয়ে গান্ধীজীকে হত্যা করেছেন। এসবই দেশ বিভাজন ও ১৯৪৮ সালে গোড়ার দিকের ইতিহাস।

*(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক, চিন্তক এবং সাংবাদিক)*

SMCTRADEONLINE.COM

HAPPY DURGA PUJA

*hope this durga puja brings in good fortune and long lasting happiness for you!*

smc

Moneywise. Be wise.

Delhi I Kolkata I Mumbai I Ahmedabad I Chennai I Dubai

New York I Orlando I Bengaluru

**SMC Global Securities Ltd.** CIN No.: L74899DL1994PLC063609 · SMC Comtrade Ltd. CIN No.: U67120DL1997PLC188881

REGIONAL OFFICE: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No. 4, 5th Floor, Kolkata - 700001 · Tel +91-33-39847000 · Fax +91-33-39847004

REGISTERED OFFICE: 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi - 110005 · Tel +91-11-30111000 · Fax +91-11-25754365 · info@smcindiaonline.com

*Disclaimer: Investment in securities & commodities market are subject to market risk*

# ব্যতিক্রমী ইসলামি বিশ্ব নজরুলের ভারত

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

‘অগ্নিবীণা’ প্রকাশের পর ‘বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’য় একটি আলোচনা ছাপা হয়। লেখা হয় : ‘আমরা কাজী সাহেবের ‘অগ্নিবীণা’ পাইয়া তাই আজ পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।... দ্বাদশটি বাছা বাছা কবিতা আছে। ... প্রত্যেকটি কবিতাই বীরত্বব্যঞ্জক— মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে নব উদ্দীপনা সঞ্চার করিবে। ... হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া যে সব অনুপম উপমা... এই কাব্যে আছে তা অপূর্ব বলে মনে করেছেন সমালোচক। (পঞ্চমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ শশাঙ্ক রাজ্যাঙ্কবর্ষ)[১] হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র নজরুলের রচনায় একটি নতুন মাত্রা এনেছিল। বাঙালিপাঠক পেয়েছিল অভিনব কবিকণ্ঠ আর কাব্যভাষা। তরুণ মুসলমান সমাজ নজরুল ইসলামকে নিজেদের করে নিয়ে উদ্দীপিত হয়েছিল।

'মাহে নাও' অর্থাৎ নতুন চাঁদ পত্রিকায় আবু জাফর শামসুদ্দীন একটি প্রবন্ধে (পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা) লিখলেন, 'সত্যিকার প্রতিভাকে কেউ কোনোদিন অস্বীকার করতে পারেনি। দুর্যোগের দিনের মুসলমানী পুঁথি হিন্দুর স্বীকৃতি না পেলেও পুঁথির চাইতে অনেক বেশি মুসলমানী মাল মশলায় সমৃদ্ধ এবং আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দে অলঙ্কৃত নজরুলের শত শত গান ও কবিতা... বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলে হিন্দুকেও স্বীকার করে নিতে হয়েছে।' (চতুর্থ বষ', ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৯, শশাঙ্ক রাজ্যাঙ্ক বর্ষ)

দুটি রচনার অভিমুখ ভিন্ন। নজরুলের লেখা প্রতিভাদীপ্ত বলেই 'বাংলা সাহিত্যের সম্পদ; সাহিত্যের মান রক্ষা করেই তিনি বঙ্গীয় 'মুসলমানের তমদ্দুনিক' জীবনে 'রেনেসাঁর সূত্রপাত' ঘটিয়েছেন বলে ওই লেখক মত প্রকাশ করেছেন।[২]

নজরুল ইসলাম কিছু ইসলামি সঙ্গীত লিখেছেন। সেসব একটি ক্ষুদ্র সাময়িক ঘটনাই মনে হয়। কারণ, এসব গানে কিছু উপমা-চিত্রকল্প আর প্রসঙ্গ-কথা সমস্ত মুসলমান-সমাজ কতটা সমর্থন করেছে সন্দেহ হয়। প্রথম ইসলামি-গানটি থেকেই এই দ্বিধার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের লোকগীতির বিশিষ্ট শিল্পী আব্বাস উদ্দিন (১৯০১-১৯৫৯ খ্রিঃ) নজরুলকে অনুরোধ করেন ইসলামি সঙ্গীত রচনা করতে। নজরুল অনুরোধ রক্ষা করে লেখেন কয়েকটি ইসলামি গান। এই ধারার প্রথম সৃষ্টি : 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ'। আব্বাসউদ্দিন এটি রেকর্ড করলেন। নজরুলের লেখা চারটি চরণ সেই রেকর্ডে নেই। এইখানে সেগুলি উদ্ধৃত করছি :

যারা) জীবন ভরে রাখছে রোজা নিত্য উপবাসী।
সেই) গরীব ত্রতিম্ মিসকিনে দে যা কিছু মফিদ্।।
তোরে) মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা।
সেই) পাথর দিয়ে তোল্‌রে গড়ে প্রেমেরি মসজিদ।।

কেন এগুলি বাদ গেল? আমাদের মনে হয় মুসলমান সমাজ এর মাধ্যমে বিভ্রান্ত হতে পারে বলে কেউ নিশ্চয় ভেবেছিলেন।

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষ নিত্য রোজা রাখছে! এ ছবিটিতে নজরুল সম্ভবত কোরান-নির্দিষ্ট বিশ্বাসকে ভিতর থেকে চঞ্চল করেছেন। আল্লাহ সমস্ত বিশ্বাসী মুসলমানের জীবন জীবিকা প্রদান করেন— একে বলে 'রিজিক'। নজরুল কি এই নির্ভরতাকে চঞ্চল করেছিলেন? নজরুল অবশ্য এই ধারণা আরও বহুস্থানেই রেখে গেছেন। 'ঈদ মোবারক'-এ এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

'দু'জনার হবে বুনন্দ্-নসিব, লাখে লাখে হবে বদ নসিব?
এ নহে বিধান ইসলামের।। (জিঞ্জীর— কাব্যগ্রন্থের কবিতাটি ১৯ চৈত্র, ১৩৩০ ব.-এ রচিত)।

বিধর্মীদের ঘৃণার পাথর দিয়ে প্রেমের মসজিদ গড়ায় কি খুব আগ্রহ ছিল না তখনকার মুসলমান-সমাজের? জানি না। এনিয়ে বেশি লেখা বাহুল্য। আরও বেশ কয়টি ইসলামি গান কিছুটা সমালোচনা ও বিতর্কের অবকাশ রেখেছে বলে মনে হয়। দুয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান—
জপে তোমারি নাম।
তারায় গাঁথা তসবী লয়ে নিশীথে আসমান—
জপে তোমারি নাম।

এ বই নিশ্চয় বিশ্বাসী মুসলমানের নাম জপার জন্য ব্যবহার্য, কিন্তু বিশ্বচরাচরে নিষ্প্রাণ জ্যোতিষ্ক সে কাজ করবে এটি কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ? বরং এখানে আছে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব।

২. ইসলামের ঐ বাগিচাতে ফুটলো দুটি ফুল।
শোভায় অতুল সে ফুল আমার আল্লা ও রসুল।।
.....
বরকতে তার হব রে পার পুল সে রাতের পুল।।

পুরসেরাত পরলোক যাত্রার একটি কঠিন বাধা। সেটি পার হতে ইহজীবনের সুকৃতি ('নেক' কাজ) দরকার। এই রূপকল্পে আসল অসুবিধা হল আল্লা ও রসুলকে 'শোভায় অতুল' ফুল ভাবায়। অরূপ ঈশ্বরের এই রূপভাবনা আর ঈশ্বর আর তাঁর পয়গম্বরকে এক করে দেখাতে কিছু তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি থাকা সম্ভব।

৩. ফতেমা জননীর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা :
হাসান-হোসেন তব উম্মত তরে মাগো—
কারবালা প্রান্তরে দিলে বলিদান।
বদলাতে তার রোজ-হাসরের দিনে
চাহিবে না মোর মত পাপীদের প্রাণ।।

হাসান-হোসেনের শাহাদাত সর্বজনীন ইসলাম-সম্মত কিনা এ প্রশ্ন কারবালার যুদ্ধ আর তার ফলাফলেই মীমাংসিত হয়নি। শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্ব আজও মুসলিম সমাজ-মনকে দ্বিধাগ্রস্ত রেখেছে। নজরুলের এই গানের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন হয়েছে বলতে পারি না।

৪. 'গরবিনী মুসলিম বালা' গানটিতেও সমস্যাটি প্রায় একরকম। তারা নিজেদের আচার আচরণের কথা বলতে গিয়ে কিছু কথা এখানে উল্লেখ করছে। যেন তারা 'কাবায় বাতি' জ্বালে, মহম্মদকে মালা দেয়, ঈদে 'শিরনীর থালা' সাজিয়ে দেয়। তাদের অহঙ্কার তারা বীর জননী :

'কতশত কারবালার রণে
বিলায়ে দিয়াছি স্বামী-পুত্র-স্বজনে।।'

কারবালার যুদ্ধ একদা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শোকের আবহ নিয়ে আসত। মীর মশারক হোসেন (১৩.১১.১৮৪৭-১৯১২)-এর 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১) একসময় বাঙালি মুসলমানের নিত্য পাঠ্য ছিল। বর্তমানে সেই আবেগ কমতির দিকে। একসময় বাংলার গ্রামগঞ্জে মহরমকে

ঘিরে মুসলমানদের জারি গানে মাততে দেখা যেত। এখন গোটা অনুষ্ঠানই নিতান্ত শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সম্প্রদায় এখন এই আচার-অনুষ্ঠানে উদাসীন থাকে। 'মহরম' মোদের ১০ তারিখে 'শহীদানে কার বালায় ইমাম হোসেন (রাঃ) রাজির শাহাদাত।' শুধু এইটুকু উল্লেখ করে ইসলামিয়া পঞ্জিকা দিনটিকে নির্দিষ্ট করেছে।[৩] এদিনে অন্তত ১৫টি কৃত্যের কথা লিখেছে ওই পঞ্জিকা; মহরমের তাজিয়া-দুলদুল বের করা, লাঠি খেলার কোনো নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়নি। দিনটি সৃষ্টি ও প্রলয়ের ইঙ্গিতবাহী। শিয়ারা শোক পালন করে আর সুন্নিপ্রধান গ্রামে গ্রামে ওইদিন লাঠি খেলা এবং তলোয়ার খেলা হয়।[৪]

৫. একটি ইসলামি গানে নজরুল লিখেছেন : 'ইসলামে নাই ছোট বড় আর আসরাফ আতরাফ।' সাম্যের ধর্ম বলে কথিত ইসলামে এমন হওয়ার কথা নয়। মুসলিম ঐতিহাসিক কুনওয়ার মহ. আশরাফ "Life and conditions of the people of Hindustan" গ্রন্থে লিখেছেন : 'হিন্দুস্থানে প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম কিন্তু ভারতীয় জীবনধারায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।'[৫] নজরুল-নির্দেশিত আসরাফ আতরাফ নয় শুধু, ভারতের মুসলিম সমাজ অজস্র ভাগে বিভাজিত। একটি ছক দিচ্ছি :

**ভারতের মুসলমান সমাজ**

- **আশারাফ**
  - **সৈয়দ সেখ পাঠান মুঘল**
- **আজলফ / আতবক**
  - **রাজপুত তেলী জোলা হাজ্জাম দরজি ধোবী কুমোর**
- **আরজল**
  - **ভাঙ্গী কামার মোমিন পটুয়া**

মন্ডল কমিশনের প্রতিবেদন খেয়াল করলে আরও অনেক অনভিজাত মুসলিম বর্গের সংবাদ পাওয়া যায়। কুনওয়ার মহ. আশারাফ থেকে নজরুল ইসলাম কারো সদিচ্ছাতেই ভারতীয় মুসলমান একটি অবিমিশ্র জনগোষ্ঠী হতে পারেনি।

ইসলামি ভাবনার সঙ্গে নজরুল নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। এব্যাপারে তাঁর দুটি একটি রচনার কথা লিখতে হচ্ছে।

সঙ্গীতপ্রেমী নজরুল

ঈদ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা সৃজনশীল উচ্চ দার্শনিকতাকে অবলম্বন করেছে। ব্রিটেনে নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশনে বিজ্ঞান-শিক্ষা সংক্রান্ত জনসংযোগ আধিকারিক জনাব কামাল রহিম একটি ছোট নাটিকা সংগ্রহ করেন। সেটির শীর্ষক 'ঈদ'। এই নাটিকা 'নজরুল রচনাবলী'তে গ্রন্থিত ছিল না। তবে এ লেখা যে নজরুলের তার প্রমাণ আছে।[৬] কয়েকজন মুসলিম চরিত্র ঈদের তাৎপর্য সন্ধান করছে এ নাটিকায়। তারা হল মহবুব, শামসের, মাহতাব, গুলশান আর বিদৌরা। তাদের লক্ষ্য 'রসের ঈদ আনন্দের ঈদ'। সেই আদর্শ উৎসব কেমন করে আসবে? মহবতের কথা সেজন্য মনের মধ্যে নিত্য আধ্যাত্মিক মানবিক ভাবানুশীলন করতে হয়, তবু তা পাওয়া যায় কি না সে রহস্যে মুহ্যমান : 'আমার ঈদ ফুরায় আবার আসে। নদী যেমন সাগরকে নিত্য পেয়ে আবার নিত্য তার পানে পাইনি পাইনি' বলে কেঁদে কেঁদে ধায়, আমার মিলন-বিরহ তার সাথে তেমনি নিত্য। এ বোঝাবার ভাষা নাই; নদী হও, তখন বুঝবে। বিরহের রোজা না রাখলে কি প্রেমের চাঁদ দেখতে?' এক জীবনব্যাপী রসানন্দের সাধনা এখানে ধরা পড়ছে। ক্রিয়াত্মক ইসলামের সঙ্গে এর সম্পর্ক ক্ষীণ। একে বেদান্তের দ্বৈতবাদী ভাষ্য ছাড়া অন্য কোনোভাবে সঙ্গতি বিধান করা সম্ভব নয়। ইসলাম এরকম দ্বৈত চৈতন্যের অনুমতি দেয় না। একে ইসলাম তমদ্দুন 'শিরক' বা 'কুফর' বলে জানে।

১৯৪১ সালে ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে নজরুল বক্তৃতার মধ্যে বলেছিলেন, 'নদী যেমন নিত্য সাগরকে পেয়েও নিত্য কাঁদে— নিত্য মিলন নিত্য বিরহের রস উপলব্ধি করে, আমি তেমনি করে তাতে যুক্ত থেকেও তার জন্য কাঁদব।'[৭] এজন্যই লিখেছি, এই নাটিকাটি যে নজরুলের, তাতে কোনা সন্দেহ নেই। নিত্য বিরহ ও মিলন — মিলনের প্রগাঢ় পরিণতিতেও বিরহের সম্ভাবনার মধ্যে Romantic agony আর

আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা থাকা সম্ভব। প্রথমটি পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি একান্তভাবেই ভারতীয়— বৈদান্তিক উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন : 'ঝরনা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়, / তেমনি করে ধেয়ে এলেন জীবনধারা বেয়ে— তখন যে ভাবটি ফুটে ওঠে নজরুলের ভাব-পরিকল্পনা তার থেকে ভিন্ন নয়। বৈষ্ণবরা একে বলেন 'প্রেম বিলাস বৈবর্ত'। ঈশ্বর যখন রস ও আনন্দের কারণে নিজেকে দ্বিধারূপে বিশ্লিষ্ট করেন — একপক্ষে পুরুষ ভাব সৎ ও চিৎ সত্তা, অন্য পক্ষে নারীভাব হ্লাদিনী বা আনন্দভাব, আর চিৎ-সত্তার কারণে ঈশ্বর এই 'অচিন্ত্য ভেদ' ও 'অভেদ'-কে জানেন অথচ যোগমায়ার প্রভাবে হ্লাদিনী-রূপিণী রাধা তা বিস্মৃত থাকেন— তখন এমনি অনাদি অনন্ত অভিসারের আয়োজন হয়। সেই মিলন একই সঙ্গে বিরহের তীব্র ব্যথায় কাতর হয়ে দেখা দেয়— 'দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'[৮]

প্রশ্ন উঠতে পারে, নজরুল ইসলাম এই ভাবটি আয়ত্ত করলেন কীভাবে? এর উত্তর, বাংলার গ্রামসমাজে বিশেষত রাঢ় মানভূমের মাটি থেকে নজরুল তাঁর কাব্যশরীরের আসল মেদ-মজ্জা ও অন্তর্গত অনুভবটি খুঁজে পেয়েছিলেন। চুরুলিয়ার 'দুখুমিঞা' ছিলেন লেটো যাত্রার দলে। বাংলার এই সব দল অনক্ষর হলেও যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরাণ-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। যে কারণে কবিয়ালরা অল্প শিক্ষিত হলেও তাদের যুক্তি আর তর্কবিতর্কে পাওয়া যায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির বহু টুকরো ছিন্ন, কিছু অভাবিত পূর্ব মণিমাণিক্য--- নজরুল-সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। ইসলামি ভাবনা সেজন্যই তাঁর রচনায় নিজস্ব এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এজন্যই নজরুল হয়েছেন ভারতপথিক। মনুষ্যত্বের এমন বিকাশ ধর্মসমন্বয়ের এমন উদার আকাশ তিনি অন্য কোথাও খুঁজে পাননি। চানওনি। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, আর সব কিছু ভাগ হলেও 'ভাগ হয়নিকো নজরুল'। আসলে নজরুলই তাঁর জন্মভূমি ও সংস্কৃতিকে মনের মধ্যে ভাগ হতে দেননি। তাঁর ভারত এক যুগ যুগান্ত ধরে অভিসিঞ্চিত সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মহাভারত।

২. নজরুলের মাতৃ-সাধনা : ভারত আত্মার নব নির্মাণ নজরুল ইসলামের তন্ত্রসাধনা, পুত্রের মৃত্যুর পর মানসিক অভিঘাত আর শ্যামাসঙ্গীতে দ্রবীভূত হবার কথা সবাই জানি। প্রয়াত গবেষক অমিয়শঙ্কর চৌধুরী বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একবিংশতি'— বিশেষ নজরুল ইসলাম সংখ্যা, মে ১৯৯৯-তে লিখেছিলেন 'নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত'। সেই লেখায় অমিয়বাবু লিখেছেন, 'একদিকে গ্রামাফোন কোম্পানির ফরমাস, আর অন্যদিকে পুত্রশোক, তারপর কালী-সাধনা, সব জড়িয়ে' দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে এক দিশাহীন পরিস্থিতিতে নজরুল নাকি এই শ্যামাসঙ্গীতগুলি রচনা করেন। তাঁর ধারণা, সে সময় উচ্চ দার্শনিক সিদ্ধান্তে আসার মতো পরিস্থিতি ও সংযোগ ঘটেনি তাঁর। ফলে তাঁর এসব গানে তিনি 'স্বাধীনতার কোন আকুতি' পাওয়ার চেষ্টা করেননি।[৯] আজ এতদিন পরে, নজরুল ফিরে পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে, অমিয়শঙ্করবাবু এই মন্তব্যে ঠিকঠাক মূল্যায়ন করেননি। নজরুলের ভাবজগত, নান্দনিকতা, গ্রহণ-ক্ষমতা আর সৃজনশীল কল্পনাকে তিনি যথাযোগ্য সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উক্ত রচনাটি তথ্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল রচিত শ্যামাসঙ্গীতের এমন পূর্ণাঙ্গ তালিকা আমাদের নজরে আসেনি। দশটি বিভিন্ন সূত্র একত্রিত করে অমিয়বাবু ২৭১টি শ্যামাসঙ্গীতের হদিশ দিয়েছেন। প্রায় ৫০টি গানের ক্ষেত্রে পাঠান্তর দেখিয়ে তিনি আগামী দিনের নজরুল-গবেষণার পথ পরিষ্কার করেছেন। গানগুলিতে নজরুলের ব্যক্তিগত হাহাকার ও অভিজ্ঞতার কিছু ইঙ্গিত নিশ্চয় পাওয়া যায়। যেমন :

১. আজই নাহয় কালই তোরে কালি কালি বলতে হবে' (নজরুল রচনা সম্ভার, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক— আবদুল আজীজ আল আমন, কলকাতা ১৯৭৬ খ্রি., ৩১২ পৃঃ)
২. 'আমার মুক্তি নিয়ে কী হবে মা, আমি তোরে চাই' (রাঙা জবা', সম্পাদক— আবদুল আজীজ আল আমন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি., পৃঃ ৪১)।
৩. '(আমায়) আর কতদিন মহামায়া রাখবি মায়ার ঘোরে' (ওই, ১৯ পৃঃ)
৪. 'কান্নাহাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা' (নজরুল গীতি', অখণ্ড, সম্পাদক — আবদুল আজীজ আল আমন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১ খ্রি., ২৭৯ পৃঃ)।
৫. 'গগনে প্রলয় মেঘের মেলা জীবন ভেলা দোলে টলমল' (ওই, ২৮৯ পৃঃ)।
৬. 'ব্রহ্মময়ী জননী মোর, মোরে অব্রাহ্মণ কে বলে' (দেবী স্তুতি', নজরুল ইসলাম, কলকাতা, ১৯৬৮ খ্রি., ৩০ পৃঃ)।
৭. 'মা আমার মনে আমার বনে ফোটে কত কুসুমদল' (নজরুল গীতি, অখণ্ড, উক্ত, পরিশিষ্ট, ৫৫৪ পৃঃ)।
৮. 'মোর বেদনার বেদী পরে জাগো জাগো হে জননী' (রাঙাজবা, উক্ত, ১৬২ পৃঃ)।
৯. 'শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহের ধূপ-কঠিতে' (রাঙাজবা, উক্ত, ৫৯ পৃঃ)।
১০. 'সংসারেরই দোলনাতে মা ঘুম পাড়িয়ে কোথায় গেলি?' (রাঙাজবা, উক্ত, ৫৩ পৃঃ)।

কিছু গানে আছে উচ্চস্তরের সৃজনশীল কল্পনার পরিচয়। যেমন,

১. 'অন্ধকার তীর্থ পথে ভাসিয়ে দিলাম নামের তরী / মায়া মোহের ঝড় বাদলে এবার আমি ভয় না করি' (অপ্রকাশিত নজরুল, সংগ্রহ ও সম্পাদনা — ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, কলকাতা, ১৯৯২

খ্রি., ৪৬ পৃঃ)।

এ গানে জপ-সাধনের ইঙ্গিত আর ভক্তমনের স্থিতি স্পষ্ট হয়েছে। কবি এখানে নান্দনিক ঊর্ধ্বায়ন তথা aesthetic sublimation আর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার আশ্চর্য সমাপতন ঘটিয়েছেন।

২. 'আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দে কাঠুরিয়ার মেয়ে' (নজরুল গীতি, অখণ্ড, উক্ত, ৩১১ পৃঃ)।

কালিকা-র সঙ্গে কাঠুরিয়া বৃত্তির সম্পর্ক নেই। কবি এখানে অহঙ্কারের বিষবৃক্ষ উৎপাটনের আকাঙ্ক্ষায় এই উপমা প্রয়োগ করেছেন। হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব এইরকম নতুন নতুন ব্যাখ্যা কল্পনাকে আশ্রয় করে প্রশ্রয় দেয়। নজরুলের ইসলামি গানে এই অবকাশ মেলার কথা নয়।

৩. 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' (নজরুল রচনা সম্ভার, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক — উক্ত, কলকাতা, ১৯৭৬ খ্রি., ১৫২ পৃঃ)।

গানটি বাঙালির স্মৃতিতে নিত্য উজাগর। আলো অন্ধকারের মহাজাগতিক প্রেক্ষিতে এ গানের রূপ নির্মাণকে Cosmic imagination বলেই গণ্য করতে হয়।

৪. 'আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে শ্যামা ভাব সমাধিতে' (রাঙাজবা, উক্ত, ৬৩ পৃঃ)।

ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ বলেও ধরা যেত এই গান। কিন্তু ভব-অভাব আর ভাব সমাধির বাকছালকে ব্যক্তিগত স্তরের ভাবনার শৈল্পিক রূপায়ণই বলতে হচ্ছে।

৫. 'আমার হৃদয় হবে রাঙা জবা দেহ বিল্বদল' (রাঙাজবা, উক্ত, ৬০ পৃঃ)।

গানটির মধ্যে আছে পুরাণ-প্রতিমা (archetypal image) যা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করছে। হৃদয় রাঙা জবা হলে দেবীর আসন অবশ্যই সুস্থিত হবার সম্ভাবনা। এ তো বাংলার দীর্ঘদিনের লোক-জীবনের পরম্পরার সত্য। এর উৎস বিষয়ে আমি একটু ভিন্ন মত পোষণ করি। তন্ত্রের প্রস্থানগুলির মধ্যে চীনাচারের কথা বলে কেউ কেউ সেজন্যই China-rose জবা ফুলের সঙ্গে তারা ও কালীর সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকেন। আমার মনে হয় এর উৎস 'মুণ্ডকোপনিষদের' অগ্নির সপ্ত-জিহ্বার বর্ণনা। শ্লোকটি এই :

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিন বিশ্বরূপী চ দেবী লোলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা।।

অর্থাৎ কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূর্মবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং বিশ্বরূপা— অগ্নির এই সাতটি রূপ। আমার বিবেচনা : 'অগ্নির তৃতীয় জিহ্বা মনোজবা, এই শব্দটি বিষমচ্ছেদ ঘটিয়ে জবাফুলের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক রচিত হয়েছে বলে আমি

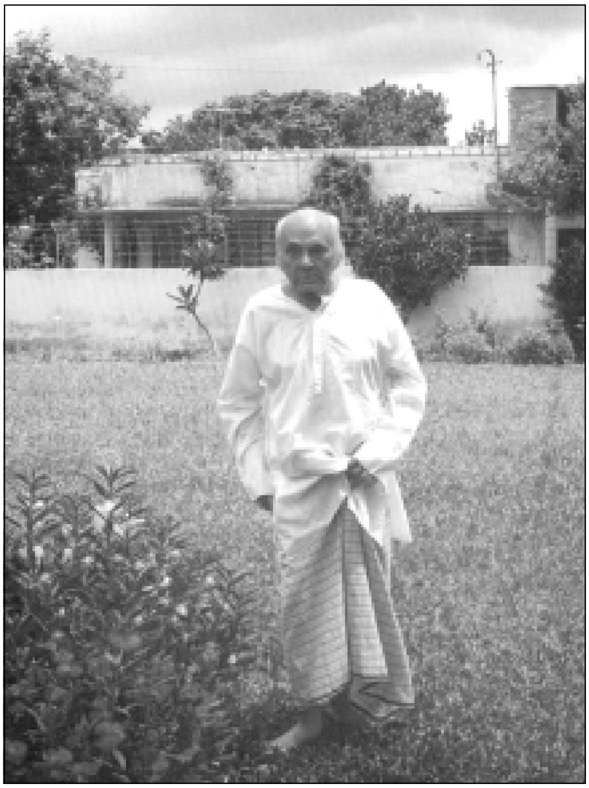

'কবি ভবনের' সামনে নজরুল।

মনে করি। মধ্যযুগের কোনো সময়ে এই বিচিত্র কল্পনার গোলযোগ হয়ে থাকতে পারে।'[১০] পাশাপাশি, নজরুল ইসলাম এখানে যথার্থ তান্ত্রিকের মতো নিজেকে শিব-স্থানিক ভাবছেন। বিল্বদল যুক্ত দেহ শব থেকে শিবে উত্তীর্ণ হয়েছে যেন। এই অপূর্ব পুরাণ-প্রতিমাটি এই গানটির মধ্যে রসঘন হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

৬. 'কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে পারবি না মা ফাঁকি দিতে।' (দেবীস্তুতি, উক্ত, ৩৫ পৃঃ)।

যে আঁধারময়ী আলোর উৎস তাঁর রূপকল্পনা বাংলার চিরদিনের সাধনা। শঙ্করাচার্য তাঁর 'আনন্দলহরী'তে এঁকেই বর্ণনা করেছেন।

৭. 'চোখের বাঁধন খুলে দে মা খেলব না আর কানামাছি' (অপ্রকাশিত নজরুল, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, উক্ত, ৫৬ পৃঃ)।

চোখের বাঁধন খোলা এ অর্থে অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন। সংসারের মায়িক-কানামাছি এড়াবার জন্য এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি শিল্প শোভন হয়েছে।

৮. 'বুঝি চাঁদের আর্শিতে মুখ দেখেছে, কালো মেয়ে কালিকা' (অপ্রকাশিত নজরুল, সংগ্রহ ও সম্পাদনা — আবদুল আজীজ আল আমান, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রি., ২৬১ পৃঃ)।

এই গানটি উচ্চ কবিত্বশক্তির পরিচয় বহন করছে। রামপ্রসাদ সেন এরকম অবকাশ এনেছিলেন একটি গানে। মেনকা কন্যার

অদ্ভুত আবদারে বিপর্যস্ত, সে চাইছে আকাশের চাঁদ :

অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
হিমালয় এসে মেয়ের হাতে দিলেন একটি আয়না
সানন্দে কহিছে হাসি ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।।

(অচিন্ত্য বিশ্বাস, সংকলন,
সম্পাদনা, ভূমিকা, প্রসঙ্গ কথা-যুক্ত :
'শাক্তপদাবলী', উক্ত, ১৫১ পৃঃ)।

বলা নিষ্প্রয়োজন, নজরুলের কবিমন রামপ্রসাদের তুলনায় আধুনিক, তিনি আলাদা করে আয়না দেবার কথা ভাবেননি, চাঁদই দেবীর মুখ চন্দ্রমার আর্শি হয়েছে।

৯. 'মা তোর চরণ কমল ঘিরে চিত্তভ্রমর বেড়ায় ঘুরে' (রাঙাজবা, উক্ত, ৪২ পৃঃ)।

আমাদের চিরাচরিত উপমাশৃঙ্খলে এই মিলটি বহুচর্চিত। মালা-রূপকের পরম্পরিত ভক্তি ভাবুকতাটিকে কৃত্রিম, তাৎক্ষণিক, ফরমাসি বলে মনে হচ্ছে না।

১০. 'শঙ্কর অঙ্গলীলা যোগ মায়া শঙ্কর শিবাণী' (দেবীসূক্ত, উক্ত, ৪১ পৃঃ)।

পরমশিব একাকী সৃষ্টির মাঝে বিমর্ষ, তাঁর 'বিমর্ষ' রূপ থেকে তিনি বিশ্লিষ্ট হলেন— সদাশিব আর প্রণব-রূপিণী আদ্যাশক্তি হলেন সৃজনের আনন্দ উদ্দীপিত। চেনা জগত সৃষ্ট হল। চব্বিশ-তত্ত্বময়ী এই সংসার বস্তুত শঙ্কর শিবানীর মায়া। কাশ্মীরের শৈব সিদ্ধান্তের এই সিদ্ধান্তের নির্যাস কীভাবে অন্তর্গত কবি-কল্পনায় ধরলেন নজরুল? বিস্ময়কর বটে!

অমিয়শঙ্করবাবু স্বখেদে লিখেছেন, নজরুল ইসলাম তাঁর শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে নাকি সমসাময়িক দেশ জাতির সংকটকে বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর বেদনাবিদ্ধ অভিযোগ : 'যিনি ছিলেন শৃঙ্খল মোচনের গান গাওয়ার, লড়াই আন্দোলনের সহযোদ্ধা, যিনি ছিলেন বিপ্লবী চারণের অকৃত্রিম উত্তরাধিকার ঋদ্ধ এক প্রতিবাদী গণকণ্ঠ, তাঁর হাত থেকে শ্যামাসঙ্গীত যেন একটু বেমানান ঠেকে।'[১১] দুটি কারণে মন্তব্যটি গ্রহণ করতে পারছি না।

প্রথম, ধর্ম সর্বত্র গণচেতনার বিরোধী এই মার্কসীয় প্রত্যয় এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। নব্য মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা ধর্ম-সংস্কৃতিকে সাধারণ মানুষের মনোজগতের শুদ্ধ এক নির্মাণ বলে মেনে নিচ্ছেন। ধর্ম-সংস্কৃতি জাতীয়তার ভিত্তি। নজরুল সেজন্যই মাতৃবন্দনা আর দেশবন্দনার এক অপরিহার্য পথ নির্দেশ করেছেন।

দ্বিতীয়, চিরাচরিত তত্ত্ব কাঠামোর পাশে সৃজনশীল কল্পনার সাহায্যে নজরুলের এক অভিনব শ্যামাসঙ্গীতের জগত গড়ে তুলেছে — তাও দেখা যাচ্ছে।

এখন সেই বিষয়ে সামান্য নজর দিতে চাই। কখনো তিনি পুরাণ-প্রসঙ্গ এনে সময়ের আশঙ্কাকে প্রকাশ করেছেন। যেমন :

১. 'আমি মৃতের দেশে এনেছিরে মাতৃ নামের গঙ্গাধারা' (অপ্রকাশিত নজরুল, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আবদুল আজীজ আল আমান, উক্ত, ১৪১ পৃঃ)।

ভগীরথের গঙ্গাবতরণের পর সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের পুনর্জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা এখানে সঞ্চারিত হয়েছে। দেশীয় মুক্তি সংগ্রামের এই আশা পূরণ অতীতের পুনর্নির্মাণ হিসাবে এই কাব্যকথা সমসাময়িক সমস্যাকে অস্বীকার করেনি।

২. 'আয় অশূচি আয় রে পতিত এবার মায়ের পূজা হবে' (রাঙাজবা, উক্ত, ৪৫ পৃঃ)। অশূচি শব্দটি ভুলভাবে মুদ্রিত হয়— 'অশুচী')।

দেশব্যাপী হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আপত্তি, অভিযোগ, আন্দোলনের পর্বে কবির এ গানকে যথার্থ দেশপ্রেমের ধর্মসম্মত উত্তরণ-পথ বলেই ধরতে হচ্ছে।

৩. 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন' (দেবীসূক্ত', উক্ত, ৫২ পৃঃ)।

এই গানের সামান্য অন্য ইতিহাস বলতে চাই। তিন দৃশ্যের 'ভূতের ভয়' শীর্ষক নাটিকায় আছে দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। আছে মত আর পথের দ্বন্দ্ব।[১২] স্বর্গ (নজরুল যাকে দেশ মাতৃকা বলছেন) দখল করেছে ভূত-অসুররা। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত চান অহিংসার সংগ্রাম পরিচালনা করতে। তরুণ বিপ্লবকুমার 'রক্তবাস' পরা দলকে 'আত্মদান করে ভয়মুক্ত করে গোলাম জাতিকে, মৃত্যুঞ্জয় কবচ বেঁধে দিয়ে' স্বাধীনতা আদায় করতে বদ্ধপরিকর। এই পটভূমিতেই এই অবিস্মরণীয় গানটি রচিত হয়। আধ্যাত্মিকতার ব্যাকুল বিহ্বলতা নয়— এ হল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে আধ্যাত্মিকতা ও পুরাণ-প্রসঙ্গের সফল প্রয়োগ।

৪. 'খড়ের প্রতিমা পূজিস রে তোরা মাকে তোরা পুজিস নে' (নজরুল গীতি, অখণ্ড, উক্ত, পরিশিষ্ট, ৫৫৪ পৃঃ)।

এই গান 'বিজয়া' নামক নাটিকার অন্তর্গত।[১৩] দেশজননী এখানে ভিখারিণী জননীতে পর্যবসিত। তাঁর পুত্ররা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘটা করে মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করছে। ভিখারিণীর সংলাপ : 'আমার দুর্বৃত্ত ছেলেরা আমায় তাড়িয়ে দিয়ে আমায় মৃতা বলে মাতৃশ্রাদ্ধ করছে, তাই দেখতে এসেছি।' চিন্ময়ী দেশজননীকে পাষাণময়ী করে রাখা শ্রাদ্ধ ছাড়া কি! ভিখারিণী জননী তাই গাইছেন :

'প্রতিমার মাঝে প্রতিমা বিরাজে হায়রে অন্ধ, বুঝিস নে।'

নাটকটির মাঝে ভিখারিণী দেবী মূর্তির মাঝে বিলীন হয়ে

গেল। সমবেতভাবে এই দেশ-জননীকে পূজা তর্পণ করার মধ্য দিয়েই নজরুল চেয়েছেন জননীর উদ্বোধন। একে পশ্চাদগতি বলা যাচ্ছে না। বস্তুত নজরুল প্রতিভার এই দিকটি বাংলার সাহিত্যমোদী শিল্প রসিকদের কাছে আমরা এখনও পৌঁছে দিতে পারিনি। একবগ্গা বামাচারী নাস্তিক আর সাময়িক সুবিধার ফটকাবাজেরা সাহিত্য জগত অস্বচ্ছ চিন্তার দ্বারা কলুষিত না রাখলে নজরুল আরও উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিতেন।

যখন তিনি গেয়ে ওঠেন, 'ভারত শ্মশান হল মা তুই শ্মশান বাসিনী বলে' (দেবী সূক্ত, উক্ত, ২৯ পৃঃ)। তখন মনে হয় জননেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত যেন এই গানটির আড়ালে প্রতিধ্বনি তুলছেন :

শ্মশান তো ভালবাসিস মাগো তবে কেন ছেড়ে গেলি।

এত বড় বিকট শ্মশান এজগতে কোথা পেলি।।[১৪]

শ্মশানে 'আনন্দমঠের' দেবী— 'মা যা হইয়াছেন।' ব্রহ্মচারী ভীত ত্রস্ত মহেন্দ্রকে বললেন, 'কালী— অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান— তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন— হয় মা!'[১৫] আমরা জানি, বঙ্কিমের মানস কল্পনায় 'মা যা হইবেন'— তিনিও ছিলেন। মহেন্দ্র সে রূপ দেখেছে। 'দিগভুজা— নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিণী— বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ বিহারিণী— দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী— বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞান দায়িনী— সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।[১৬]

দেশজননীর ধৃতব্রত নজরুল ইসলামের ভারতপথিক হওয়ার পথটি দীর্ঘ। আমরা কেবল দুটি প্রান্ত দেখালাম। পরে কখনো পূর্ণতর অবকাশে প্রসঙ্গটি আনা যাবে।

**অনুষঙ্গ :**

১. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত : 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০); বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৬৯ খ্রি.। (২৫৩-২৫৪ পৃঃ) পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক, মো. শহীদুল্লাহ আর মো. মোজাম্মেল হক ছিলেন সম্পাদক।

২. ড. ইসরায়েল খান সম্পাদিত : 'পূর্ব বাঙলার সাময়িক পত্র (১৯৪৭-১৯৭১); বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৯ খ্রি.। ৭৫০ পৃঃ। আবদুর রশিদ ছিলেন এর সম্পাদক, 'মাহে নাও' প্রথম দিকে প্রকাশ পেত করাচীর পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ থেকে।

৩. খন্দকার মোহ: মাজহারুল আমিন প্রকাশিত 'তাজমহল মার্কা ইসলামিয়া পকেট পঞ্জিকা' ইসলামিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৪২৪ সন; ৫৬ পৃঃ।

৪. মিলন দত্ত সম্পাদিত : 'চলিত ইসলামি শব্দ কোষ'; গাঙচিল, কলকাতা, মার্চ ২০০৮, ১৯৪ পৃঃ।

৫. কুনওয়ার মহ. আশরাফ : 'হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা', পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮০ খ্রি.। ১৪৮ পৃঃ। মূল রচনা প্রকাশ পায় ৮ এপ্রিল, ১৯৫৯ খ্রি.।

৬. 'ঈদ' সংখ্যা, 'দৈনিক ইত্তেফাক'; ৭ বৈশাখ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।

৭. দেখুন, অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'রূপক ও কৌতুক নাটিকায় নজরুল ইসলাম'; বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নজরুল— শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ; পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রকাশিত; ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রি.। ২২৭ পৃঃ।

৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত : 'শ্রী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'; মধ্য লীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ পশ্য।

৯. অমিয় শঙ্কর চৌধুরী : 'নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত'; অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত 'এক বিংশতি', বিশেষ নজরুল ইসলাম সংখ্যা, মে, ১৯৯৯; কলকাতা, ১২৬-১২৭ পৃঃ।

১০. অচিন্ত্য বিশ্বাস : (সঙ্কলন, সম্পাদনা, ভূমিকা, প্রসঙ্গকথা) : 'শাক্ত পদাবলী'; রত্নাবলী, কলকাতা; এপ্রিল, ২০১৬ খ্রি., ৩৯ পৃঃ।

১১. অমিয় শঙ্কর চৌধুরী : 'নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত'; উক্ত, ১২৫ পৃঃ।

১২. 'বেতার জগৎ', ১৬ অক্টোবর, ১৯৩৯ খ্রি. প্রকাশিত।

১৩. ওই।

১৪. অচিন্ত্য বিশ্বাস : (সঙ্কলন, সম্পাদনা, ভূমিকা, প্রসঙ্গ কথা) : 'শাক্ত পদাবলী'; উক্ত, ৭০৩ পৃঃ।

১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'আনন্দমঠ'; প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

১৬. ওই।

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

# गर्ग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

## M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039
Fax : 91-120-2712051

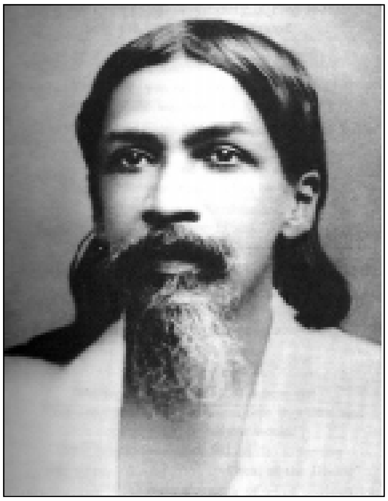

# নিবেদিতা-অরবিন্দ
# ঝড়ের পাখি

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

১৯০২ থেকে ১৯১১ সাল। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই সময়কালটিকে বলা হয় 'নিবেদিতা যুগ'। মূলত এই সময়কালে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯০২ সালে স্বামীজীর প্রয়াণের কয়েকমাস আগে ইয়োরোপ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন নিবেদিতা। ১৯০১ সালের শেষ পর্বে ফ্রান্সের লাহিসোঁতে অবস্থানকালে রাশিয়ান দার্শনিক এবং বিপ্লবী পিটার ক্রপটকিনের একটি সুদীর্ঘ রচনা পড়ে নিবেদিতা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন এবং তখন থেকেই তিনি ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের ইচ্ছাও তাঁর প্রবল হয়ে ওঠে। এক অর্থে বলতে গেলে এই পিটার ক্রপটকিন ছিলেন নিবেদিতার রাজনৈতিক গুরু। স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতে আসারও

অনেক আগে, ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ক্রুপটকিনের সঙ্গে পরিচয় নিবেদিতার। এবং ক্রুপটকিনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেইসময় আয়ারল্যান্ডে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে নিবেদিতার। কিন্তু ১৮৯৮ সালে যখন স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিবেদিতা ভারতে আসেন, তখনও ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই সেভাবে ছিল না। ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণাটি হয় ওই ১৯০১ সালে, বিদ্যালয়ের কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য বিলেতে গিয়ে সেখানে অবস্থানকালে, ক্রুপটকিনের ওই লেখা পাঠ করে। ১৯০২ সালে কলকাতায় ফিরে আসার পর নিবেদিতার পরিচয় হয় জাপানি শিল্পমন্ত্রী কাকুজো ওকাকুরার সঙ্গে। ওকাকুরা ছিলেন জাপানি জাতীয়তাবাদী। ওকাকুরার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর নিবেদিতা-ওকাকুরা একত্রে কিছু রোমাঞ্চকর বিপ্লব পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও তাতে স্বামী বিবেকানন্দের একদম সায় ছিল না। সিস্টার ক্রিশ্চিন তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, দেশবাসী ওইসময় এই বিপ্লবকে গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। তাদের প্রস্তুত না করে এই ধরনের কর্মকাণ্ড করা হঠকারিতারই শামিল হবে। এছাড়াও আরও একটি আপত্তি ছিল স্বামীজীর। সেটিও সিস্টার ক্রিশ্চিনকে জানিয়েছিলেন। ক্রিশ্চিন বলেছেন, স্বামীজী মনে করতেন ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে কোনো বিদেশির বসা উচিত নয়। স্বামীজীর এই নির্দেশকে কিন্তু নিবেদিতা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়লেও, তার নেতৃত্বে কিন্তু কখনো নিবেদিতা বসতে চাননি। বরং নেতৃত্ব তিনি অরবিন্দ ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বকেই দেখতে চেয়েছেন।

নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার এই রোমাঞ্চকর বিপ্লব পর্যায়টি ছিল স্বল্পকালের, মাত্র সাত মাসের। স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ঠাকুর পরিবার সম্পর্কে তোমার মোহ যেমন কেটে গিয়েছে, তেমনই এই মোহ (ওকাকুরা সম্পর্কেও) তোমার কেটে যাবে। স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গিয়েছিল। স্বামীজীর প্রয়াণের পর নিবেদিতা ক্রমশ বুঝেছিলেন, কতখানি দূরদর্শী ছিলেন তাঁর আচার্য। ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চকর বিপ্লব অভিযান যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য তা স্বামীজীর প্রয়াণের পর ক্রমে উপলব্ধি করতে থাকেন নিবেদিতা। এই সময় ওকাকুরার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়েও তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে থাকে। ক্রমশ নিবেদিতা ওকাকুরা যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে যায়। স্বামীজীর প্রয়াণের পর বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদিতা বেরিয়ে পড়েন ভারত পরিভ্রমণে। আর ১৯০২ সালের অক্টোবরে ওকাকুরা ফিরে যান জাপানে।

এই ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে ১৯০২ সালের অক্টোবরে বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের পরিচয়। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই নিবেদিতা ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অতি সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০২ সালের অক্টোবরে বরোদার মহারাজার অতিথি হিসাবে নিবেদিতা সেখানে যান। অরবিন্দ তখন বরোদার রাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড়ের কর্মচারী হিসাবে সেখান কর্মরত। নিবেদিতাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানাতে আরও একজন রাজকর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও গিয়েছিলেন। 'অরবিন্দ অন হিমসেল্ফ' গ্রন্থে অরবিন্দ বলেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় বরোদায়, যখন তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ও তারপর তাঁর বাসস্থানরূপে নির্ধারিত বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দেবার জন্য স্টেশনে গিয়েছিলাম। বরোদার মহারাজার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

অরবিন্দ-নিবেদিতার এই প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বড় বড় রাজকর্মচারীর সঙ্গে অরবিন্দও স্টেশনে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের স্টেশনেই প্রথম সাক্ষাৎ। স্টেশন হইতে গাড়ি নিবেদিতাকে লইয়া শহরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে রাজ অমাত্যরা আছেন, অরবিন্দও আছেন। পথে নিবেদিতা কলেজের মিনার গম্বুজওয়ালা বাড়ি দেখিয়া বলিলেন, "What an ugly pile"। ভারতীয় স্টাইলে গৃহস্থের ছোট বাড়ি দেখিয়া বলিলেন, "Oh! how beautiful!"। একজন রাজঅমাত্য অরবিন্দের কানে কানে বলিলেন, "I say, she is mad" (পাগল নাকি!)।— বারীন ঘোষ লিখেছেন রাজ অমাত্যরা আর্ট সম্বন্ধে ক অক্ষর গোমাংস। সুতরাং নিবেদিতার দৃষ্টি তাঁহারা পাইবেন কোথা হইতে। কিন্তু নিবেদিতার এই উক্তির মধ্য দিয়া অরবিন্দ নিশ্চয়ই তাঁহার (নিবেদিতার) মনের পরিচয় প্রথম পাইয়াছিলেন।' ভারতকে যে নিবেদিতা চিনেছেন, ভারতের হৃদয়কে যে নিবেদিতা স্পর্শ করতে পেরেছেন— তা সেদিনই বুঝেছিলেন অরবিন্দ।

নিবেদিতাকে এভাবে ভারতকে চিনতে সাহায্য করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দই। এক্ষেত্রে রামায়ণের আদিকাণ্ডের ঋষি বিশ্বামিত্র এবং রামের সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতার। রামায়ণের আদি কাণ্ডে আমরা দেখি, অরণ্যে অত্যাচারী রাক্ষসদের বধ করতে ঋষি বিশ্বামিত্র সঙ্গে নিয়ে চলেছেন কিশোর রাম এবং লক্ষ্মণকে। কিন্তু সে কি শুধুই রাক্ষস বধ করতে নিয়ে যাওয়া? তা তো নয়। যাত্রাপথে বিশ্বামিত্র যে এই বিশাল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন রামচন্দ্রের। যাত্রাপথে বিশ্বামিত্র বর্ণনা করছেন এক একটি রাজ্যের পরম্পরা, তার সমাজজীবন, রাজনীতি, ইতিহাস— সবই। এমনকী কোন

রাজ্যে কী শস্য উৎপাদন হয় তার বিবরণও। রাতে শোন নদীর তীরে বসে বিশ্বামিত্র এই মহান দেশের চিত্র তুলে ধরছেন। শ্রোতা কিশোর রামচন্দ্র। তেমনই ১৮৯৮ সালে কলকাতা এসে পৌঁছনোর পর স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে নিয়ে ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। চিনিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে। তাঁর 'মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন— 'যে সকল মহানগরী সৌন্দর্যে স্বীকৃতি ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শুধু তাহাদের বিষয় যে স্বামীজী আগ্রহের সহিত আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহা নহে। আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত-খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তাঁহার তন্ময়ভাব যেরূপ প্রগাঢ় হইত, এমন আর বোধহয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিরূপে ভাগে জমি চাষ করা হয়; অথবা প্রত্যেক খুঁটিনাটিসহ কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করিতেন...।' ফলে এই ভারতপথিক নিবেদিতাকে বরোদায় প্রথম দর্শনে চিনে নিতে অরবিন্দের ভুল হয়নি। তবে সাক্ষাৎ দর্শনের আগে থেকেই নিবেদিতা এবং অরবিন্দ যে পরস্পরের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তা অরবিন্দের স্মৃতিচারণা থেকেই জানা যায়। 'অরবিন্দ অন হিম সেল্ফ' গ্রন্থে অরবিন্দ বলেছেন, 'ঐকালে আমি তাঁর (নিবেদিতার) কালী দা মাদার গ্রন্থ পড়ে মোহিত। আমার মনে হয় বইটির বিষয়ে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। তিনি বলেন, তিনি শুনেছেন যে আমি শক্তি-উপাসক। তার দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমি তাঁরই মতো গুপ্ত বিপ্লবী দলের অন্তর্ভুক্ত। বরোদার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি তাঁকে গুপ্ত বিপ্লবে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন— সেইসময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি মহারাজাকে বলেন, তিনি আমার মারফত তাঁর (নিবেদিতা) সঙ্গে যোগযোগ করতে পারবেন। সয়াজীরাও যথেষ্টই চতুর ছিলেন, এইরকম মারাত্মক কাজে ঝাঁপ দেবার পাত্র ছিলেন না, তিনি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলেননি।' সেটাই স্বাভাবিক। কারণ বরোদার রাজা গায়কোয়াড় ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের কৃপাপ্রার্থী। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখা নিবেদিতার জীবনী থেকে জানা যায়, নিবেদিতার ওই প্রস্তাবের পরে নিবেদিতাকে সয়াজি রাও একটি চিঠি পাঠান। সে চিঠি পড়ে নিবেদিতা যথেষ্টই হতাশ হন। পরদিন নিবেদিতা আবার দেখা করেন সয়াজী রাওয়ের সঙ্গে। কিন্তু কোনোরকম সাহায্য বরোদার মহারাজার কাছ থেকে নিবেদিতা পাননি।

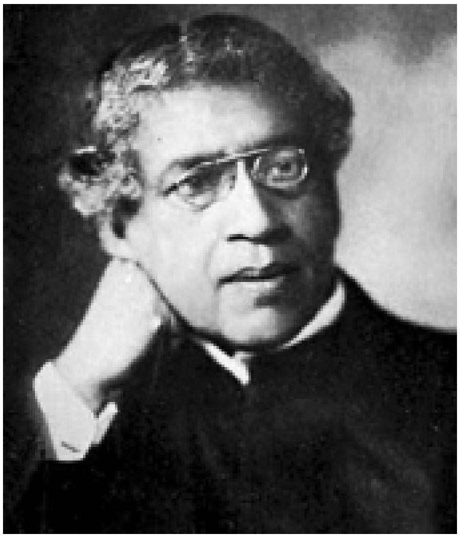

*জগদীশচন্দ্র বসু*

নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই অরবিন্দ বাংলা থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করার জাল তৈরি করেছিলেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের (টেরোরিস্ট) একটি গুপ্তচক্র আছে। ঠাকুর সাহেব তাহার প্রেসিডেন্ট। তিনি তখন দেশে নাই। বৈপ্লবিক কাজের শলাপরামর্শের জন্য জাপান গিয়াছেন। তাঁহার পদে অরবিন্দ গুপ্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট হইয়া কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। ১৯০২ সালের প্রথমভাগে গাইকোয়াড়ের বাঙালি দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে অরবিন্দ সরলাদেবীর নিকট চিঠি দিয়া বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কলকাতা পাঠাইয়াছেন। অরবিন্দর নির্দেশে যতীন ব্যানার্জি সার্কুলার রোডে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তারপর অরবিন্দ নিজেও এই গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং মেদিনীপুরে গিয়া হেমচন্দ্র কানুনগোকে একহাতে গীতা ও একহাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্ত সমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। মেদিনীপুরের কাঁকড়পূর্ণ মাঠে গর্তে ঢুকিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া চাঁদমারি শিক্ষা দিয়াছেন।... এই পটভূমিকার উপর যখন অরবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, ঠিক তখনই নিবেদিতার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং নিরালায় কথাবার্তা হয়।'

গিরিজাশঙ্কর আরও লিখেছেন, 'প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই উভয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। একত্রে কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সে কাজটি হইল ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত করা। অরবিন্দ যে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে আসিয়া গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্ব উদ্বোধন করিযাছেন, সে কথা তিনি নিশ্চয়ই নিবেদিতাকে বলিয়াছেন। কেননা, কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিতা অরবিন্দ প্রবর্তিত গুপ্ত সমিতির প্রথম পর্বে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।' অরবিন্দ নিজেও স্বীকার করেছেন— বাংলা থেকেই তিনি সর্বপ্রথম বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'অরবিন্দ অন হিমসেল্ফ গ্রন্থে' অরবিন্দ জানিয়েছেন— এ লক্ষ্যে তিনি পাঁচ সদস্যের একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন। যার অন্যতম সদস্য করেন নিবেদিতাকে। কাজেই

গিরিজাশঙ্করের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সঠিক বলেই মনে হয়। অরবিন্দ এবং নিবেদিতা দুজনেই বিপ্লবী কর্মধারার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের পরে এনিয়ে নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হয়েছিল, যে কারণে কলকাতায় ফিরে এসেই নিবেদিতা এই পরিষদে যোগ দিতে দ্বিধা করেননি। অরবিন্দও নিবেদিতার ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস রাখার কারণেই তাঁকে এই পরিষদের অন্যতম সদস্য করতে দ্বিধা করেননি। তবে এই বিপ্লবী পরিষদ খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মূলত অরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষের উপদলীয় কার্যকলাপের জন্যই তা ভেঙে যায়। তবে তা অন্য প্রসঙ্গ।

নিবেদিতা-অরবিন্দের প্রথম পরিচয় প্রসঙ্গে নিবেদিতার ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'নিবেদিতা আর অরবিন্দ পরস্পরের অপরিচিত ছিলেন না। অরবিন্দের কাছে নিবেদিতা হলেন 'কালী দ্য মাদারের' রচয়িত্রী। অসংখ্য দেশনেতার হাতে হাতে ঘুরেছে এই নিবন্ধটি। আর নিবেদিতার কাছে অরবিন্দ হলেন ভাবী যুগের দেশনায়ক। চারবছর আগে বম্বের প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ জ্বালাময় প্রবন্ধ লিখে একটা সংগ্রামের সূত্রপাত করেছেন তিনি। বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতিটি সভ্যকে নিজের হাতে নানা বিষয়ে চৌকশ করে তুলেছিলেন। দেশের বৈপ্লবিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত কর্মের খাতে বইয়ে দিয়ে এই সমিতি যথাসময়ে জনসমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ভারতপ্রীতি আর মুক্তিপিপাসায় নিবেদিতা আর অরবিন্দের মাঝে মিল ছিল। তার চেয়েও গভীরতর মিল ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকান্দের প্রতি দুজনের ঐকান্তিক শ্রদ্ধায়।'

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করাই যায়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখা থেকে মনে হয়— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি অরবিন্দর আকর্ষণ সম্ভবত বৃদ্ধি পায় নিবেদিতার সান্নিধ্যে আসার পরই। জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী অবলা বসুর কথা উদ্ধৃত করে গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন যে, 'স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডি অবলা বসু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, জগদীশচন্দ্র বসু এবং অরবিন্দ ঘোষ উভয়েই নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নিবেদিতাই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ বইখানি অরবিন্দকে বরোদায় প্রথম সাক্ষাতের সময়ই পড়িতে দেন। এই বইখানি পড়িয়াই অরবিন্দ যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন।' তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি অরবিন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বরাবরই প্রকাশ পেয়েছে। অরবিন্দ তাঁর 'ভবানী মন্দিরে' মানব দেবতা হিসাবে কল্পনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শক্তি'— একথা অরবিন্দ নানা জায়গায় নানাভাবে বলেছেন। অরবিন্দর ঘরে একটি ছোট কৌটায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মাটি রক্ষিত ছিল। আলিপুর বোমার মামলার কালে যখন পুলিশ অরবিন্দর ঘর তল্লাশি করে এই কৌটাটি পায়, তারা জানতে চেয়েছিল এর ভিতর কী আছে। শান্ত কণ্ঠে অরবিন্দ উত্তর দিয়েছিলেন— একটি বিস্ফোরক পদার্থ। ভীত সাহেব পুলিশ অফিসার জানতে চেয়েছিলেন, বিস্ফোরক পদার্থটি কী? অরবিন্দ শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন— দক্ষিণেশ্বরের মাটি। অরবিন্দ পণ্ডিচেরি চলে যাবার পর তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী রামকৃষ্ণ মিশনের সংঘজননী সারদা দেবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর দীক্ষা গ্রহণের কথা শুনে অরবিন্দ বলেছিলেন— 'আমি জেনে সুখী হলাম যে, আমার স্ত্রী সাধনাতে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে।' অরবিন্দ তাঁর 'ধর্ম ও জাতীয়তা' নিবন্ধে এও লিখেছেন— 'কবে সেই দিন আসিবে, যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন।'

আর নিবেদিতা তো নিজেকে নিবেদিতই করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণে। নিজেকে নিবেদিতা বলতেন— 'নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী ভাব প্রচারের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। স্বামীজীর ভাবনায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এদেশের যুব সমাজকে। এমনকী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়াকেও তিনি মনে করতেন স্বামীজীরই কাজ। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার ফরাসি জীবনীকার নিজেল রেমঁ লিখেছেন, স্বামীজীর আর এক ঘনিষ্ঠ আমেরিকান অনুগামিনী জোসেকিন ম্যাকলাউড নিবেদিতার লেখা অনেকগুলি চিঠি রেমঁকে দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে অনেক চিঠিতে স্বামীজীর সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগের কথা বলা আছে। এও বলা আছে, স্বামীজীর নির্দেশেই নিবেদিতা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন।

নিবেদিতার আর এক জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি (অরবিন্দ) স্বদেশকে জড় পদার্থরূপে দেখার পরিবর্তে সাক্ষাৎ জননীর ন্যায় ভক্তি করে, পূজা করে তাহার সহিত নিবেদিতার মতের এবং মনের সংযোগ ঘটা বিচিত্র নহে। দেশের প্রতি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিবেদিতা পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনই কথাপ্রসঙ্গে বাহির হইতে দেখিতে শান্তশিষ্ট, নিরীহ ব্যক্তির এই মনোভাব নিশ্চিত উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। তাঁহার (নিবেদিতার) লোক চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সুতরাং বৈদেশিক শাসন হইতে দেশমাতৃকার মুক্তিলাভের জন্য অরবিন্দের কর্মপ্রণালীর প্রতি নিবেদিতার সহানুভূতি এবং সমর্থন খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত'।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ অরবিন্দ যেমন স্বদেশকে জননীরূপে কল্পনা করেছেন, তেমনই নিবেদিতাও কিন্তু জাতিতে আইরিশ হলেও ভারতবর্ষকে জননীরূপেই কল্পনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের অন্যতম

আবাসিক ছাত্র প্রমথরঞ্জন নাগের স্মৃতিচারণের উল্লেখ করা যায়। প্রমথবাবু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, '১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক রবিবার বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউসের আবাসিক ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিবেদিতা বলিতেছেন— "You all are required first to know your Motherland - your great Mother"।

MOTHER BHARAT BARSHA

I would advise you to see Her, go round Her, to konw Her people, their religion, culture, literature, language, customs and traditions, in one word their history thoroughly to meet them and mix with them intimately often whenever such an opportunity occurs to love them. Just as a son or a daughter behaves or mites with his or her mother freely and intimately, so you should love her, respect Her, serve Her, worship Her with most reverential salutations".

Bande Mataram.

প্রমথরঞ্জন জানিয়েছেন, 'বন্দে মাতরম্ কথাটি নিবেদিতা সুস্পষ্টভাবে সংস্কৃতে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রমথরঞ্জন তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, ১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে যে পূত শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল তা অল্পদিনেই ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে মাতৃমন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন।'

এই সমমানসিকতাই নিবেদিতা আর অরবিন্দকে কাছাকাছি এনেছিল। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাবান করে তুলেছিল। নিবেদিতা সম্পর্কে অরবিন্দ তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন— 'বিপ্লবী নেতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ; বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর মাঝে। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই— তাঁর খাঁটি স্বরূপ— বেরিয়ে আসত। তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হতো। যোগ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে আগুন। তাঁর বই 'কালী দি মাদার' উদ্দীপনাপূর্ণ বই; তেমনি বিদ্রোহমূলক, অহিংস নয়। রাজপুতানায় ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন'।

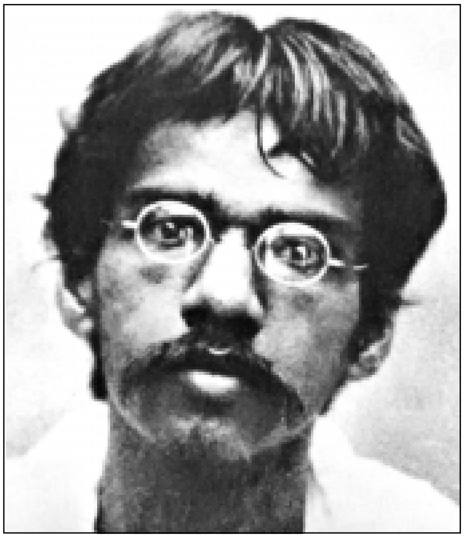

*বারীন ঘোষ*

অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করলেও অরবিন্দ সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু লেখেননি নিবেদিতা। তাঁর কিছু চিঠিপত্রে অরবিন্দের উল্লেখ ছাড়া। সেসব চিঠিপত্রেও অরবিন্দের উল্লেখ করেছেন সাংকেতিক ভাষায়। এর একটি কারণ অবশ্যই ছিল। আইরিশ বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত নিবেদিতা জানতেন, কোনো বিপ্লবী নেতার জীবদ্দশায় তাঁর এবং তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু লেখার অর্থ তাঁকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া। অরবিন্দকে সেই বিপদের দিকে তিনি ঠেলে দিতে চাননি। যে কারণেই প্রকাশ্যে অরবিন্দ সম্পর্কে কিছু লেখেননি। আর প্রয়োজনীয় কোনো চিঠিপত্রে অরবিন্দের প্রসঙ্গ এসে গেলে তাকে আড়াল করার জন্য সাংকেতিক ভাষায় অরবিন্দের পরিচয় লিখতেন। যেমন— 'A.G.' 'Recalcitrant Leader (R. L. infuture)', 'Bengali Mazzini', 'Missing Journalist', 'Leader of the Nationalist' ইত্যাদি। বোঝাই যায়, অরবিন্দের নিরাপত্তা নিয়ে কতখানি ভাবিত ছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা বরাবরই অরবিন্দকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে গণ্য করতেন। এবং ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়া অরবিন্দের থেকেও আত্মগোপন করে থাকা অরবিন্দ অনেক বেশি কার্যকরী হবে বলে মনে করতেন নিবেদিতা। যে কারণেই সামসুল আলম হত্যার পর যখন অরবিন্দকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করবে মনস্থ করে— তখন তাঁকে গোপনে পণ্ডিচেরি পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন নিবেদিতাই।

অরবিন্দর সঙ্গে নিবেদিতার যা যোগাযোগ তা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলেছেন, 'তাঁর সঙ্গে আমার সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে গোপন বৈপ্লবিক ক্ষেত্রেই। আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, তিনি তাঁর কাজ নিয়ে এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার বা একত্রে সিদ্ধান্ত করার কোনো ঘটনা ঘটেনি।'

তবে অরবিন্দ যাই বলুন, 'একত্রে পরামর্শ করার ঘটনা ঘটেনি'— অরবিন্দ গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, অরবিন্দ ভ্রাতা বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষের বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

জানিয়েছেন— বারীন্দ্র ঘোষ তাঁকে বলেছিলেন, 'নিবেদিতা তাঁর বরোদা ভ্রমণের সময় থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত।' বারীন্দ্র তাঁর 'অগ্নিযুগ' গ্রন্থে লিখেছেন— 'ভগিনী নিবেদিতা চরমপন্থী নেতা রূপে শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী।' নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দ গোষ্ঠীর যোগাযোগের কথা জানাতে গিয়ে বারীন্দ্র ঘোষ লিখেছেন— 'সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরির জাতীয়তা বিষয়ক প্রায় দেড়শ দুশো বই নিঃস্বত্ব হয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পুস্তক সংগ্রহের ভিতর ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ রিপাবলিক, গ্যারিবল্ডি এবং ম্যাটসিনির জীবনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, টডের রাজস্থান, টমকাকার কুটির, মহাভারত, রামায়ণ, দাদাভাই নৌরজি, রমেশ দত্ত ও উইলিয়ম ডিগবির ব্রিটিশ অর্থনীতির বই। ভারতের ইতিহাস, য়ুরোপের ইতিহাস, ইংলন্ডের ইতিহাস, ক্রমওয়েলের জীবনী, ব্লক-এর 'War made impossible', একখানি আধুনিক ব্যাপক ধ্বংসমূলক বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের বিবরণ-সংবলিত বই, ব্যারন ওকাকুরার বই— এমনই প্রায় দেড়শ উল্লেখযোগ্য সুপাঠ্য পুস্তক।'

বারীন্দ্র আরও লিখেছেন, 'বিপ্লবী অরবিন্দর সঙ্গে এই যে তেজস্বিনী অগ্নিমুখী নারীর যোগাযোগ হলো ১৯০১ (১৯০২ হবে) থেকে, তাঁর (নিবেদিতার) মৃত্যু অবধি তা অবিচ্ছিন্ন ছিল। তাঁর অনুরোধেই ধর্ম এবং কর্মযোগীদের কাজ অসমাপ্ত রেখে অরবিন্দ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য চন্দননগরের পথে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাংলার গুপ্তচক্রের সঙ্গে ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একাধিকবার তাঁর কাছে গুপ্তচক্রের কাজে গিয়ে বাগবাজারের স্কুলবাড়িতে দেখা করেছি।... নিবেদিতার প্রদত্ত লাইব্রেরিই ১০৮ নং আপার সাকুলার রোড চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎসস্থল। তাঁর সঙ্গে যতীনদার (যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি) কথাই ছিল, এই বইগুলি অবলম্বনে সেখানে রাজনীতি শেখাবার ও কর্মী গড়বার স্কুল করতে হবে।'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'অরবিন্দ তাঁহার গুপ্ত সমিতির দলকে এই রূপ সংগঠন এবং কর্মের কৌশলে কোনোদিন শিক্ষা দেন নাই, কেননা উহা তিনি জানিতেন না। ভগিনী নিবেদিতা অরবিন্দর গুপ্ত সমিতিকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।' এইরূপ শিক্ষা বলতে গিরিজাশঙ্কর বুঝিয়েছেন, গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপ। যে বিপ্লবী কার্যকলাপে নিবেদিতার হাতে খড়ি হয়েছিল ভারতে আসার অনেক আগেই। আয়ারল্যাণ্ডে অবস্থানকালে, আইরিস বিপ্লবী গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে এসে। গিরিজাশঙ্কর আরও লিখেছেন, 'অরবিন্দর গুপ্ত সমিতির দলকে ভগিনী নিবেদিতার গুপ্ত সমিতির দল বলিলে কিছু মিথ্যা বলা হয় না।' গিরিজাশঙ্করের বক্তব্য— 'অরবিন্দের হাতে গুপ্ত সমিতির যে দলটি ছিল, নিবেদিতা আগাগোড়া সেই দলটিকে পরিচালিত করিয়াছেন। অরবিন্দ অপেক্ষা গুপ্ত সমিতির টেকনিক ভগিনী নিবেদিতার বেশি জানা ছিল।'

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিবেদিতা যে আগাগোড়াই সক্রিয় ছিলেন, তার আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় বারীন্দ্র ঘোষের আরও কিছু লেখায়। লিজেল রেমঁর সংগ্রহে বারীন্দ্র ঘোষের যে তিনটি পত্র পাওয়া গিয়েছে— তাতে বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের প্রমাণ পরিষ্কার। ১৯৫২ সালের ৪ মে একটি চিঠিতে বারীন্দ্র লিখেছেন— 'আমাদের বিপ্লবী যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন— তিনি সেখানেও প্রেরণার উৎস। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলি পরবর্তী বিরাট জাগরণ এবং বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রবল প্রভাব।' এরও অনেক আগে, ১৯৩৯ সালের ১৮ আগস্ট একটি পত্রে বারীন্দ্র লিখেছেন, ''... সিস্টার নিবেদিতা 'কালী দি মাদার' নামে একটি প্রেরণাদায়ী পুস্তিকা লিখেছিলেন। বইটি আমাদের কর্মীদের কাছে উদ্দীপনার কারণ হয়েছিল।'' ওই পত্রেই বারীন্দ্র আরও বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমি আমার ভ্রাতার (অরবিন্দ) সঙ্গে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে একাধিকবার গিয়েছি। আমার অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতর সংযোগ। ... যখন আমি প্রায় কোনো তহবিল ছাড়া কলকাতায় কেন্দ্র চালাচ্ছিলাম, তিনি আমাকে বলেন, এইরকম মহৎ উদ্দেশেও অর্থভিক্ষা করবে না। অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করবে।' রেমঁ সংগ্রহে বারীন্দ্রের আর একটি লেখায় দেখা যাচ্ছে তিনি লিখেছেন, '১৯০২ সালের আগস্ট থেকে ১৯০৬ সালের আগস্ট— এই পুরো চার বছর ভগিনী নিবেদিতা বাংলা ও ভারতে কাজ করেছেন— বক্তৃতা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, রচনা এবং নানাবিধ কার্যাবলীর দ্বারা তরুণদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করেছেন। বৈপ্লবিক ভারতের যথার্থ নেতা শ্রীঅরবিন্দ চিত্রে আবির্ভূত হবার পূর্বে এইসকল ঘটেছে। এমনকি ১৯০২ সালের আগেই তিনি তরুণ ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদারের মারফত পি মিত্র ও সি আর দাশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।'

বস্তুত, ১৯০২ সালে বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় ও কথাবার্তা হওয়ার পরই নিবেদিতা পরম উৎসাহে যুবকদের সংগঠিত করা এবং বৈপ্লবিক বাণী প্রচারের কাজে নেমে পড়েন। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দের আর এক সহযোগী বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর স্মৃতিচারণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালে মাসিক বসুমতী পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় এই স্মৃতিচারণাটি প্রকাশিত হয়। ওই স্মৃতিচারণ এবং নিবেদিতার লেখা পত্র থেকে জানা যায়, ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে নিবেদিতা পাঁচদিন মেদিনীপুর শহরে ছিলেন। হেমচন্দ্র লিখেছেন, 'তিনি এখানে পাঁচদিন ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। সকালে সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রথম দিনের বক্তৃতায় অনেক

লোক এসেছিল। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বে অনেকে সরে পড়েছিল। একজন উচ্চ কর্মচারী তাঁকে বলেছিলেন— 'আপনার বক্তৃতায় রাজনীতির তীব্রতা বেশি ছিল বলে অনেকে সরে পড়েছিলেন। পরের বক্তৃতায় হয়তো লোক হবে না।' ইহার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি আমায় ভয় দেখাবেন না। আমার শিরাতে স্বাধীন জাতির রক্ত এখনও প্রবাহিত। যারা ভয় পায়, আমার বক্তৃতা তাদের জন্য নহে।' আর একদিন তিনি স্থানীয় ভদ্রমহিলাদের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু-একজন স্ত্রীলোককে বন্দুক ছুঁড়তেও শিখিয়েছিলেন।'

*ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত*

অরবিন্দের বিপ্লবী গোষ্ঠীকে প্রদত্ত নিবেদিতার লাইব্রেরি যে আসলে বিপ্লবের 'ছোট বড় মৌচাক' গড়ে তোলার কেন্দ্র ছিল সে কথাও পাওয়া যায় বারীন্দ্র ঘোষের লেখায়। বারীন্দ্র তাঁর 'বোমার কাহিনী'তে লিখেছেন, '...কথা ছিল রাজনীতির স্কুল করে, ইতিহাস, জীবনী ও ডিগবি, রমেশ দত্ত, নৌরজী আদির অর্থনীতি প্রভৃতি বই পড়িয়ে এখানে কতগুলি পলিটিক্যাল মিশনারি গড়া হবে। এবং তারপরে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাদের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট-বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হবে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতিক ক্লাসের। তারপর এসে জুটল দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্র নন্দী— এই ধরনের অনেক মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লব কেন্দ্রটির সহিত পরিচয় করিয়ে দিলুম। দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে শিবাজীভক্ত মহারাষ্ট্র সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীনদার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতি ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।' অরবিন্দ গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের এইসব সাক্ষ্যই প্রমাণ করে অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে কতটা যোগাযোগ এবং সহযোগিতা ছিল নিবেদিতার।

শুধুমাত্র যে অরবিন্দের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড এবং দেশভক্তির প্রতি নিবেদিতা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা নয়। অরবিন্দের লেখনি শক্তিকেও অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন নিবেদিতা। নিবেদিতা নিজেও ছিলেন অসামান্য শক্তিশালী লেখিকা। ভারতে আসার আগে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিবন্ধ বিদগ্ধ জনের প্রশংসা লাভ করেছিল। ভারতে আসার পর মডার্ন রিভিউ এবং দ্য স্টেটসম্যানের মতো পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিবন্ধগুলিও যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছিল। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম তিনটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন এবং পরিমার্জন করে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের প্রথম ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার রচিত গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বেরও শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছিল। যেহেতু নিজে শক্তিশালী লেখিকা ছিলেন, সে কারণে অন্যের লেখা সম্পর্কেও একটু খুঁতখুঁতে মনোভাব ছিল নিবেদিতার। দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলা ভাষা ও ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটিরও পাণ্ডুলিপি সংশোধন এবং পরিমার্জন করেছিলেন নিবেদিতা। দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিকথায় জানা যায়, ওই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনের সময়, সামান্যতম ভুল চোখে পড়লেও দীনেশচন্দ্রকে তিরস্কার করতেন নিবেদিতা। এ-হেন নিবেদিতা কিন্তু অরবিন্দের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করতে দ্বিধা করেননি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মডার্ন রিভিউ পত্রিকার ১৯০৯ সালের জুন মাসে অরবিন্দর লেখা "To the sea" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পাঠ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৯০৯ সালের ২৪ জুন ঘনিষ্ঠ সুহৃদ এস কে র‍্যাটফ্লিককে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লেখেন — 'এই কবিতাটি অপূর্ব। বিপিনের (বিপিনচন্দ্র পাল) কারাগারে বসে লেখাগুলির থেকে এটা কত পৃথক— তাই না।' অরবিন্দর সম্পাদিত কর্মযোগিন পত্রিকা এবং ওই পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দর লেখাগুলি সম্পর্কেও উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি নিবেদিতা। ১৯১০ সালের ২০ জানুয়ারি র‍্যাটফ্লিককেই আর একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন— 'আমি চাইছি, প্রতি সপ্তাহেই তুমি কর্মযোগিন পত্রিকাটি পাও। মননশক্তি এবং মুন্সিয়ানা— দুটিরই অপরূপ প্রকাশ ঘটে। অরবিন্দ তুলনাহীন।' অরবিন্দর রচনাশৈলীর প্রতি এতটাই গুণমুগ্ধ ছিলেন নিবেদিতা যে, তিনি চেয়েছিলেন অরবিন্দর জাতীয়তাবাদী লেখাগুলির একটি সংকলন প্রকাশ করতে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে অরবিন্দর লেখার সংকলন প্রকাশ করা যে সহজসাধ্য হবে না— তা জানতেন নিবেদিতা। সেজন্য তিনি বিদেশ থেকে এরকম একটি সংকলন প্রকাশ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের ২৬ জুন র‍্যাটফ্লিককে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লেখেন— 'অরবিন্দর লেখাগুলি এবং বিচারের সময় (আলিপুর বোমা মামলা) উপস্থাপিত বক্তব্যগুলি

নিয়ে একটা বই প্রকাশ করার খুব ইচ্ছা আছে আমার। এই বইয়ের একদম শেষে থাকবে To the sea। এটি প্রকৃত হিন্দুধর্মের সঠিক নমুনা। আর বইয়ের ভূমিকায় থাকবে বিচারের বিবরণ, সওয়াল-জবাবের নির্বাচিত অংশ এবং বিচারপতির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ... এই বইটি ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশ করতে পারলেই ভালো হয়। তার জন্য যদি কিছু খরচ হয় তো হোক। এব্যাপারে তুমি কি ক্রপটকিনের সঙ্গে কথা বলে কোনো প্রকাশক জোগাড় করতে পারবে? এটনম্যান বা অন্য কোনো প্রকাশক? ইংল্যাণ্ডে প্রকাশ করার সুবিধা তুমি বুঝতে পারবে। আর বইটি তৈরি হয়ে গেলে তোমার মতামত দেবে।' নিবেদিতা মনেপ্রাণে চাইলেও অরবিন্দর রচনার সংকলন অবশ্য সেসময় প্রকাশ করা যায়নি। তবু নিবেদিতা কিন্তু শেষপর্যন্ত এই ধারণাই ব্যক্ত করেছিলেন— 'জাতীয়তা দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে বিবেকানন্দের হৃদয় থেকে। জগদীশচন্দ্র বসু এর মর্ম বোঝেন। তবে জগদীশচন্দ্র জনপ্রিয় নেতা নন। গোখেল একে বোঝে কিনা সন্দেহ। ... অরবিন্দ ঘোষই একমাত্র ভারতীয় মনস্বী পুরুষ তিনি জাতীয়তাকে সৃষ্টিশীল চরিত্রে আয়ত্ত করতে পেরেছেন।'

অরবিন্দের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম এবং লেখনিশক্তির যতই অনুরাগী হন না কেন, সবক্ষেত্রেই যে অরবিন্দকে সমর্থন করেছেন নিবেদিতা— বিষয়টি এমনও নয়। আগেই বলেছি— নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দর সম্পর্কটা মূলত ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। অরবিন্দর বিপ্লবী কার্যকলাপের সহায়ক হয়েও সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন কিন্তু নিবেদিতা করেননি। ১৯০২ থেকে ১৯১১— নিবেদিতার এই ন'বছরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তিনটি ধারা সক্রিয় ছিল। একটি গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখের নেতৃত্বাধীন মডারেট গোষ্ঠী, দ্বিতীয়টি বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই প্রমুখের নেতৃত্বাধীন চরমপন্থী, তৃতীয়টি বিপ্লবী গোষ্ঠী। এই বিপ্লবী গোষ্ঠীটি পরিচালিত হতো অরবিন্দের নেতৃত্বে। নিবেদিতার মানসিকতা এবং রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা এই বিপ্লবী গোষ্ঠীর কাছাকাছি ছিল। কাজেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অরবিন্দর গোষ্ঠীর সঙ্গেই তাঁর সখ্য বেশি ছিল। তবে, মডারেট বা চরমপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গেও নিবেদিতার দূরত্ব ছিল না। ওই দুই গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গেও নিবেদিতার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে সম্বন্ধে নিবেদিতা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গোখলের আমন্ত্রণে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নিবেদিতা বেনারসেও গিয়েছিলেন। গোখলেও নিবেদিতার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিবেদিতার অসুস্থতার সময় রাত জেগে তাঁর সেবা করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন গোখলে। যদিও মডারেট গোখলে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবেন— তা নিয়ে শেষপর্যন্ত সংশয়েই ছিলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতা অন্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এই সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখলেও অরবিন্দ তাতে রাজি ছিলেন না। বরং গোখলে সম্পর্কে অরবিন্দ প্রকাশ্যেই তাঁর বিদ্বেষ প্রকাশ করতেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অরবিন্দ বলেছেন— 'নিবেদিতার একটা ব্যবহার আমার কাছে অবোধ্য ছিল— গোখলেকে তিনি খুব সমীহ করতেন। কোনো বিপ্লবীর পক্ষে গোখলেকে শ্রদ্ধা করা আমার ধারণার অতীত। গোখলে ছিল যাকে বলে, as tepid as warm water।'

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতেই পারে। একবার গুজব রটেছিল যে, বিপ্লবী গোষ্ঠীর কিছু সদস্য গোখলেকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে— এই সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'মি. গোখলে ১৯০৬ সালে একটি চিঠি পাইলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। নিবেদিতা এই চিঠির কথা জানিয়া পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী যুবকদের একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তুমি কি ইহা করিয়াছ? আমি সম্ভব মনে করি না। এখন যে সময়, তাতে নিজেদের মধ্যে এরূপ খুনাখুনি করা উচিত হবে না।'

এই ঘটনার কথা অরবিন্দও তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন। অরবিন্দ বলেছেন, 'একবার গোখলের জীবন সংশয়াবস্থায় নিবেদিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, 'মি. ঘোষ আপনার দলের ছেলে কি এই কাণ্ড করেছে?' আমি বললাম না। তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে কোনো Free lancer হবে।'

বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা এবং ওঠাবসা থাকলেও, নিবেদিতা বরাবরই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের কথা বলতেন। বেনারসে কংগ্রেস অধিবেশন চলার সময় তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে কথোপকথনে এই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যে কারণে গোখলে বা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো নরমপন্থী নেতাদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। নিবেদিতা মনে করতেন, রাজনৈতিক মত যাই হোক না কেন, গোখলে বা রমেশচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বের দেশভক্তিতে কোনো খাদ ছিল না। নিবেদিতা এই রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠলেও, অরবিন্দ তা পারেননি। বরং অরবিন্দ বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদের শত্রুবৎ মনে করেছেন বরাবর।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি ঘটনায় নিবেদিতা অরবিন্দের আচরণ সমর্থন করেননি। আলিপুর বোমা মামলা থেকে খালাস পেয়ে অরবিন্দ নানা জায়গায় উত্তেজক বক্তব্য রাখছিলেন। এটি নিবেদিতার পছন্দ হয়নি। অরবিন্দের এই আচরণকে নিবেদিতার মনে হয়েছিল 'অবিবেচনাপ্রসূত'। নিবেদিতা মনে

করেছিলেন এর ফলে আবার অরবিন্দের গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা বাড়বে। নিবেদিতা ব্রিটিশ কারাগারে বন্দি অরবিন্দের বদলে অন্তরালে থাকা বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ অনেক বেশি কার্যকর হবে মনে করতেন। অরবিন্দর এইসব উত্তেজক বক্তব্য যে পুলিশের চোখে পড়েছে, সে সংবাদও নিবেদিতা পেয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের ২৪ জুন এস কে র‍্যাটক্লিককে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছিলেন— 'আমরা ডেইলি মেল-এ দেখেছি বরিশালে অরবিন্দর বক্তৃতার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তিনি অশ্বিনীর (অশ্বিনীকুমার দত্ত) প্রশংসা করেছেন এবং বয়কট আন্দোলন করার কথা বলেছেন। পুলিশ এই ভাষণের নোট নিয়েছে।' পাশ্চাত্যে কিছুদিন অবস্থান করার পর ১৯০৯ সালে কলকাতায় ফিরে এসে নিবেদিতা এ সম্পর্কে সতর্কও করেন অরবিন্দকে। কিন্তু অরবিন্দ মনে হয় নিবেদিতার সে সতর্কবার্তায় কর্ণপাত করেননি। কারাগারে অবস্থানকালে তাঁর দেবদর্শন হয়েছিল বলে অরবিন্দ জানিয়েছিলেন। তখন থেকে অরবিন্দ নিজেকে 'ঈশ্বরচালিত' মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন— 'অরবিন্দ অবতার বনবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন।' অলৌকিকতার ওপর অরবিন্দের এই ঝোঁক নিবেদিতার ভালো লাগেনি। ১৯০৯ সালের ২১ জুলাই র‍্যাটক্লিককে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন— 'আমাকে যদি চিঠি লেখো, তাতে আমার নাম উল্লেখ করবে না। আমি এখন পরিচয় গোপন করে রয়েছি। অনেকদিন সেভাবেই থাকব। বন্দে মাতরমের পর একটা নতুন কাগজ প্রকাশিত হয়েছে— কর্মযোগিন। অরবিন্দ খুব বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। তবে আমার মতে, সেটা খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ হচ্ছে না। অরবিন্দ নিজেকে ঈশ্বরচালিত মনে করছেন— ভাবছেন সে জন্য গ্রেপ্তার হবে না। আমরা অনেকেই অনেক সময়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করি— কেন করি, সে শুধু আমরাই জানি। কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই কারোকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেননি। ... ধর্মীয় অনুভূতি এবং অভিমত আর রাজনৈতিক রণকৌশলকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।'

এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার, ১৯০৯ সালে নিবেদিতা যখন ভারতে ফেরেন তখন তাঁরও গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। সেই সময় ছদ্মবেশে তিনি কলকাতায় পা রাখেন এবং

*জোসেফিন ম্যাকলিয়ড*

পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন ছদ্মবেশেই ঘোরাঘুরি করেন। এসম্পর্কে স্বামীজীর আর এক বিদেশিনী শিষ্যা সিস্টার দেবমাতার স্মৃতিচারণ স্মর্তব্য। ওই সময় বাগবাজারে বোসপাড়ার বাড়িতে সিস্টার ক্রিশ্চিনের সঙ্গে সিস্টার দেবমাতাও অবস্থান করছিলেন। সিস্টার দেবমাতা লিখেছেন, 'নিবেদিতা আমাকে যতদিন সম্ভব কলকাতায় আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন— আমি তাঁর আত্মগোপনের সহায়ক হয়েছিলাম। বিদ্যালয়ে আমি পৌঁছবার কিছু পরে তিনি ইউরোপ থেকে ফিরেছিলেন। আমি দেখে অবাক— তিনি একেবারে আধুনিকতম ফ্যাশনে সজ্জিত, মাথায় মস্ত সাদা হ্যাট, পালক গোঁজা, পরিপাটি জমকালো গাউন। আমি বললাম, 'নিবেদিতা, কী কাণ্ড! আমি ভেবেছিলাম তুমি সন্ন্যাসিনীর পোশাক পর।' তিনি উত্তর দিলেন, 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমাকে ভারতে না ফেরার জন্য লিখে পাঠানো হয়। কারণ, ভারতে পদার্পণ করলেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তারির শাসানি দিয়ে রেখেছে। আমি কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি জানতাম, আমার এই পোশাক দেখে তারা সন্দেহ করতে পারবে না।' পুলিশ সম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণা যথাযথ, কারণ যখন আমি বাগবাজারের সরু গলি দিয়ে হাঁটতাম, প্রায়ই আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করা হতো— 'আপনি কি সিস্টার নিবেদিতা?' যখন বলতাম না, তখন তারা স্থির করত— আমি স্কুলের দ্বিতীয় সিস্টার। ... আমার কোনো রাজনৈতিক সংশ্রব ছিল না বলে তারা স্কুলে বিশেষ নজর দেয়নি, ফলে নিবেদিতা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।'

নিবেদিতার এই ছদ্মবেশ ধারণের পরিকল্পনার কথা আরও জানতে পাওয়া যায় তাঁর চিঠিপত্রে। ভারতে রওয়ানা হওয়ার আগে ১৯০৯ সালের ৯ মার্চ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখা একটি চিঠিতে নিবেদিতা ছদ্মবেশ ধারণের জন্য একটি 'মসলিন গাউন' চেয়েছেন তাঁর কাছে। ওই বছরই ১১ মে একটি চিঠিতে জোসেফিন ম্যাকলাউডকে জানাচ্ছেন তাঁর দেওয়া পোশাক পরে ছদ্মবেশ ধারণে কতটা সফল হয়েছেন। এই ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু এবং অবলা বসুও যে তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে কথা নিবেদিতা ১৯০৯ সালের ১৫মে বোন মেরি উইলসনকে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তবে, অরবিন্দ মনে করতেন,

নিবেদিতার গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা কম। অরবিন্দ পরবর্তীকালে বলেছেন, 'ঐকালে নিবেদিতার বিপদের কোনো প্রশ্নই ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্ত্বেও উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল— ফলে গ্রেপ্তারের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।' তবে, অরবিন্দের এই ধারণাটি সঠিক ছিল না। উচ্চপর্যায়ের ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নিবেদিতার অনেক বন্ধু ছিলেন নিঃসন্দেহে। স্বয়ং ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর স্ত্রী লেডি মিন্টোর সঙ্গেই নিবেদিতার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তাঁরা নিবেদিতার গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা পুরোপুরি দূর করতে পারেননি। নিবেদিতার এই বন্ধুরাই তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন— কলকাতায় ফিরলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। বন্ধুরা বুঝেছিলেন, নিবেদিতাকে রক্ষা করার চেষ্টা বিফল হতে পারে। তদুপরি বন্ধুদের ভিতর কেউ কেউ নিবেদিতার পিছনে চরবৃত্তি করেছিলেন। যেমন, লেডি মিন্টো, কর্নোলিয়া সোরাবজি প্রমুখ।

চারদিকে যখন চাপা সন্ত্রাস এবং পুলিশি নজরদারি ও হেনস্থার ছবি, তখন অরবিন্দের ওপর যে গোয়েন্দাদের বিশেষ নজর থাকবে এ বলাই বাহুল্য। মুরারিপুকুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার এবং অরবিন্দের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যাবতীয় তথ্যাদি হাতে পাওয়ার পর অরিবন্দ তখন পুলিশের চোখে সবথেকে ক্ষতিকারক ব্যক্তি। অবশ্য বোমার মামলায় অরবিন্দকে ব্রিটিশ সরকার বেশিদিন কারাগারে আটকে রাখতে পারেনি। চিত্তরঞ্জন দাশের সওয়ালের ফলে বোমার মামলার বিচারক নর্টন অরবিন্দকে চরম দণ্ড দিতে পারেননি। একবছর কারাবাসের পর অরবিন্দকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার। এছাড়াও অরবিন্দের সহযোগীরাও অরবিন্দকে আড়াল করতে সক্রিয় ছিলেন। অরবিন্দ ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান, এটা তাঁরা চাননি। যে কারণে বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী বোমার মামলায় যাবতীয় দায় নিজেদের ওপর নিয়ে দ্বীপান্তর ভোগ করেছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে অরবিন্দের নাম ফাঁস করে দিয়েছিলেন বলে তাকে কারাগারের ভিতরে তাকে গুলি করে হত্যা করেন কানাইলাল এবং সত্যেন। এই দুজনেরই ফাঁসি হয়। তারও আগে অরবিন্দকে বাঁচাতে নিজের কাঁধে যাবতীয় দায় নিয়ে বন্দেমাতরম পত্রিকার মামলায় জেল খেটেছেন বিপিনচন্দ্র পাল। অরবিন্দের নির্দেশেই যুগান্তর মামলাতেও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিজের কাঁধে সমস্ত দায় নিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

কারাগারে থাকাকালীন অরবিন্দের ভিতর কিছু মানসিক পরিবর্তন এসেছিল। অলৌকিকত্বের প্রতি অরবিন্দের একটি স্বভাবগত আকর্ষণ বরাবরই ছিল। কিন্তু এবার তাঁর ভিতর একটি আধ্যাত্মিক বোধেরও প্রকাশ দেখা গেল। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর অরবিন্দ বললেন, কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতার মর্মবাণী বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফলে সচল ও জড় বস্তু— সবেতেই তিনি বাসুদেবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করছেন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মে মাসে উত্তরপাড়ার একটি সভাতেও অরবিন্দ তাঁর এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বললেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন। না দেখিয়া মিথ্যা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার দেখার ফলে বৃক্ষ বাসুদেবে পরিণত হয় নাই। বৃক্ষ বৃক্ষই রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে বলে দৃষ্টিভ্রম। এক বস্তু অবলম্বনে অপর বস্তু দেখা, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম। উইলিয়াম জেমস প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদগণ ইহাকে বলিবেন, "Illusion", যাহা নয়, তাহাই দেখা, "due to misdirected imagination" আমাদের বৈদান্তিকেরা ইহাকে বলিবেন 'অধ্যাত্ম'।

কারা অভ্যন্তরে আরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল অরবিন্দের। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর ভাবধারা তাঁকে দেশমাতৃকার রূপ কল্পনা করতে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু কারাবাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের প্রভাবে সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে 'কর্মযোগিন' পত্রিকা প্রকাশ করে তার প্রথম সংখ্যাতেই লিখলেন— "Ramakrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Shankaracharya"। আর একটি পরিবর্তনের কথাও অরবিন্দ জানিয়ে দিলেন। এর আগে জাতীয়তাবাদকেই ধর্ম বলে স্বীকার করেছিলেন তিনি। কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর হিন্দুত্বকেই জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ বলে প্রচার করলেন। লিখলেন, "I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith; I say that it is the Sanatana Dharma which for us is nationalism"। অরবিন্দ জানালেন, স্বপ্নে স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শনই তাঁর ভিতর এই পরিবর্তন সাধিত করেছে, তাঁকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করেছে।

১৯০৯ সালের ৬ মে খালাস পান অরবিন্দ। আলিপুর বোমার মামলায় তখন এগারো জন বিপ্লবী নির্বাসিত। মুক্তি পেয়ে অরবিন্দ দেখলেন তিনি কার্যত একা। অনুভব করলেন, পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে আবার তাঁকে গোপনে বিপ্লবী চক্র গড়ে তুলতে হবে। এর কিছুদিন পরেই ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে নিবেদিতা ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। নিবেদিতা ইংল্যান্ড থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবার ঠিক একদিন আগে, ১৯০৯ সালের ৯ জুলাই লন্ডনে কার্জন উইলিকে হত্যা করলেন মদনলাল ধিংড়া। অনেকেই মনে করেন, নিবেদিতা পাশ্চাত্যে বিপ্লববাদের পক্ষে যে প্রচার চালিয়েছিলেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই ধিংড়া কার্জন উইলিকে হত্যা করেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'ধিংড়ার কার্যকলাপ শুধু ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডেই আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই, পরন্তু ইউরোপের বহু বিপ্লবের কেন্দ্রে অভূতপূর্ব

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। আয়ারল্যাণ্ডে বড় বড় প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল— "Eire ধিংড়াকে সম্মান করিতেছে।" ইহাতে কি নিবেদিতার হাত ছিল না!

'আয়ারল্যাণ্ড যাহাকে সম্মান করিতেছে, আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী মেয়ে নিবেদিতাও যে তাহাকে সম্মান করিতেছেন, একথা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইবে না। নিবেদিতা এই সম্পর্কে কোনো অভিমত ব্যক্ত করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার নিস্তব্ধতার মধ্যেই ধিংড়াকে তাঁহার সমর্থক আমরা বুঝিতে পারিতেছি।'

কার্জন উইলিকে হত্যার পর সংবাদ রটে গেল— অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার তোড়জোড় করছে সরকার। অরবিন্দকে যে কোনো ছুতোনাতায় কারাবন্দি করতে চাইছিল ব্রিটিশ সরকার। এ সংবাদ নিবেদিতার কানেও পৌঁছেছিল। ১৯০৯ সালের ৩০ জুলাই র‍্যাটক্লিফকে একটি পত্রে নিবেদিতা লিখলেন, 'শুনছি নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বাঙালি মাৎসিনিকে (অরবিন্দ) নির্বাসনে পাঠানোর কথা ভাবছেন। পুলিশের কাছ থেকে সরকারিভাবে আবেদন এলেই তিনি তা কার্যকর করবেন।' নিবেদিতা এব্যাপারে সতর্কও করেছিলেন। অরবিন্দ তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'আমার এইপ্রকার এক সাক্ষাতের কালে তিনি (নিবেদিতা) আমাকে জানালেন— সরকার আমাকে চালান দেবার মতলব করছে। তিনি চান, আমি যেন গা-ঢাকা দিই, কিংবা ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করি, এবং বাইরে থেকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাই। ... আমি তাঁকে বললাম, ঐ সাজেশন গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না; তার বদলে কর্মযোগিনে একটা খোলা চিঠি লিখব, যা আমার ধারণা সরকারকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। সে কাজ করা হয়েছিল। পরে যখন তাঁর (নিবেদিতার) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তিনি বললেন, আমার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, এবং আপনাকে চালান দেবার বাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।'

অরবিন্দ আসলে সরকারকে বিভ্রান্ত করার জন্য কর্মযোগিন-এ একটি লেখা লিখেছিলেন সেইসময়। অরবিন্দ কর্মযোগিন-এ 'দেশবাসীর প্রতি একটি খোলা চিঠি'-তে লিখলেন— "Rumour is strong that a case for my deportation has been submitted to the Government by the Calcutta Police, and neither the tranquitity of the country nor the seruplous legality of our procedure is a guarantee against the contingency of the all-powerful fiat of the Government watch-dogs' silncing scrupules on the part of those who advise Simla"।

অরবিন্দ এই খোলাচিঠিতে ধিংড়া হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বাধীনতা অর্জনের কথা বললেন। অরবিন্দ লিখলেন— "Our ideal of Swaraj involves no hatred to any other nation nor of the administration which is now established by law in this country... our methods are to... evolve a government of our own for our internal affairs so fur as that could be done without disobeying the law or questioning the legal authority of the bureaucratic administration... The nationalist party stood for democracy, constitutionalism and progress"।

অরবিন্দ নরম সুরে এইসব কথাবার্তা লিখে সরকারক বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন। বিপ্লবের পথ থেকে তিনি সরে এসেছেন— কৌশল করে এরকম একটা ধারণাই গড়ে দিতে চেয়েছিলেন সরকারের মনে। নিবেদিতাও চেয়েছিলেন অরবিন্দর এই কৌশলী চালটি কার্যকর হোক। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চমহলের নজরে এই লেখাটি পড়ুক এবং অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার পরিত্যাগ করুক— এমনটিই চেয়েছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু নিবেদিতার মনে আর একটি সংশয়ও ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল অরবিন্দের এই খোলা চিঠি ভারতসচিব লর্ড মর্লের নজরে যাতে না আসে— তার জন্য ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ আধিকারিকরা সচেষ্ট থাকবে। ১৯০৯ সালের ৫ আগস্ট র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা লিখলেন— 'এ সপ্তাহেই তোমার কাছে কর্মযোগিন পৌঁছে যাবে। এর মধ্যে যে 'খোলা চিঠি' আছে তা বিভিন্ন মহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। আমার মনে হয়, এর কপি মর্লে ও সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে ওঁদের কাছে ওটা হয়তো নাও পৌঁছতে পারে।'

কিন্তু অরবিন্দকে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা নিয়ে নিবেদিতার সংশয় কখনোই কাটেনি। ১৯০৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর র‍্যাটক্লিফকে একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন— '... জাতীয়তাবাদীদের নেতাকে গ্রেপ্তারের ও কয়েক সপ্তাহের জন্য জামিন না দেওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে।' তাঁর খোলা চিঠি প্রকাশিত হবার পরেও গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা যে একেবারে কমে যায়নি, তা অরবিন্দও বুঝেছিলেন। সেটি জানা যায় নিবেদিতার চিঠিতে। ১৯০৯ সালের ১ ডিসেম্বর নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে লেখেন— 'অপ্রতিরোধ্য নেতাটি (অরবিন্দ) আমার কাছে খবর পাঠিয়েছেন, ভারত সরকার তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার অনুমতি দেবার জন্য বারবার জনকে (জন মার্লে) তাগাদা দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, জন অন্য বন্দিদের (আলিপুর বোমা মামলার) মুক্তির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আই জি ওই আদেশের ব্যাপারে তাকে সতর্কবাণী শোনান। আর তাতেই নাকি জন বিভ্রান্ত।'

অরবিন্দকে কারাগারের বাইরে রাখা বিপজ্জনক তা ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারছিল। বিশেষ করে আলিপুর বোমা মামলার ৯ জন নেতা ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে মুক্তি পাবার পর ব্রিটিশ সরকার আরও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয়, মুক্তিপ্রাপ্ত এই বিপ্লবীদের সঙ্গে আরও একবার অরবিন্দ গোপন বিপ্লব প্রচেষ্টায় রত হতে পারেন। সরকারের এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে দিলেন অরবিন্দ নিজেই। আলিপুর বোমা মামলার এই ৯ জন বিপ্লবীর মুক্তি পাওয়ার ঘটনায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টো মোটেই খুশি হননি। এ নিয়ে ভারতসচিব মর্লের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধও হয়েছিল। মিন্টো বলেছিলেন — "We are now face to face with an anarchial conspiracy waging war against British and Indian communities alike"।

মিন্টোর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন অরবিন্দ। ১৯১০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কর্মযোগিন-এ লিখলেন— "Anarchism -- it is different from terrorism. The Irish Fenians did the same thing as the Indian Terrorists are now practicing, but nobody ever called then Anarchists"।

অরবিন্দের এই লেখাটিই প্রমাণ করল বিপ্লবীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন তাঁর তখনও রয়েছে। এর আগে কর্মযোগিনে সরকারকে বিভ্রান্ত করতে যতই নরম সুরে লিখুন না কেন, আইরিশ সিন-ফিন বিপ্লবীদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বিপ্লবীদের প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে বসলেন। এরপরে পুলিশও অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করায় আরও অননমনীয় হয়ে উঠল।

এইরকম যখন পরিস্থিতি, সেইসময় ১৯১০ সালের জানুযারির গোড়ায়, পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সামসুল আলম আদালতে আততায়ীর গুলিতে মারা যান। আলিপুর বোমার মামলায় আলম ছিলেন সরকারি পক্ষের ডান হাত। এই হত্যাকাণ্ডের পর অরবিন্দের কিছু লেখা সরকারকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। সামসুল আলম হত্যাকাণ্ডের পর ১৯১০ সালের ২৬ জানুয়ারি কর্মযোগিন-এ অরবিন্দ বিপ্লবীদের এই কাজকে খোলাখুলি সমর্থন করলেন। এই কাজকে "Boldest of the many bold acts" বলে অভিহিত করলেন অরবিন্দ। লিখলেন— "Boldest of the many bold acts of violence... Thay (the terrorists) prefer public places and crowded buildings - Nasik London - Calcutta - Goshwami (Naren Gossain) in Jail - three are remarkable features"।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে, আলমকে খুনের পূর্বে অরবিন্দকে স্পষ্ট জানানো হইয়াছিল এবং তিনি সম্মতিও দিয়েছিলেন। সরকারও মনে করত, সামসুল আলম হত্যাকাণ্ডে অরবিন্দই ছিলেন মূল মন্ত্রণাদাতা। সামসুল আলম হত্যাকাণ্ডের পর সরকার যে কোনো উপায়ে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দকে খালাস দেওয়া ভুল হয়েছিল বলেই মনে করতেন সরকারি কর্তারা। লেফটেনান্ট গভর্নর বেকার তাঁর সরকারি নোটে অরবিন্দ সম্পর্কে লিখেছিলেন — "not a mere blind, unreasoning tool, but an active genrrator of revolutionary sentiment"। তাঁর গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অরবিন্দ কলকাতা থেকে ফরাসি চন্দননগরে পালিয়ে যান। অরবিন্দের গোপনে কলকাতা ত্যাগের পিছনে নিবেদিতার ছিল সবথেকে বড় অবদান।

অরবিন্দ ঠিক কোন তারিখে কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয়, ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক সময়ে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেছিলেন। অরবিন্দের প্রস্থানের কাহিনি যাঁরা বিদ্ধৃত করেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই জানিয়েছেন, নিবেদিতার পরামর্শে অরবিন্দ কলকাতা ত্যাগ করে প্রথমে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর ও পরে পণ্ডিচেরিতে আশ্রয় নেন। অরবিন্দের অন্তর্ধান সম্পর্কে অবশ্য নানারকম ভাষ্য পাওয়া যায়। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, যোগীন মা-র ভাগনে একদিন নিবেদিতাকে এসে জানালেন, সরকার অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসনে পাঠাবার মতলব করছে। বাগবাজারে দেখা করতে এলে নিবেদিতা অরবিন্দকে এ খবর দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যেতে বললেন, নইলে তাঁর কাজে বিঘ্ন ঘটবে। অরবিন্দ বললেন, 'তাঁর দরকার হবে না। কর্মযোগিন-এ একটা খোলা চিঠি ছাপালেই সরকার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' তাই হল। শেষপর্যন্ত অরবিন্দকে চলে যেতেই হলো। হঠাৎ একদিন রামচন্দ্র মজুমদার খবর আনলেন, কাল সকালে কর্মযোগিন অফিসে খানাতল্লাশ হবে, অরবিন্দ গ্রেপ্তার হবেন। আলাপ আলোচনার আর সময় নেই। বন্ধুদের নানা উত্তেজিত মন্তব্যের মাঝেই অরবিন্দ সুস্পষ্ট আদেশ শুনতে পেলেন, 'চন্দননগরে চলে যাও'। দশ মিনিটের মাঝে বিশ্বস্ত দুটি সঙ্গীকে নিয়ে তিনি গঙ্গার তীরে হাজির হলেন। তারপর সেখান থেকে নৌকায় করে সোজা চন্দননগর। নিবেদিতাকে খবর দেবার তখন সময় ছিল না। পরদিন কর্মযোগিন অফিস থেকে একটি লোক এসে বলে গেল, কাগজের ভার নিবেদিতার হাতে দিয়ে অরবিন্দ চলে গেছেন।'

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের যোগীন মা তাঁহার এক আত্মীয় পুলিশ শশীভূষণ দে-র নিকট শুনিলেন যে অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি মঠে ফিরিয়া স্বামী সারদানন্দকে এই

খবর দিলেন। খোঁজ নিয়া জানা গেল, খবর ঠিক। স্বামী সারদানন্দ গণেন মহারাজকে অরবিন্দের নিকট পাঠাইলেন। গণেন মহারাজ দৌড়াইয়া কর্মযোগিন অফিসে অরবিন্দের নিকট গেলেন। অরবিন্দ এই সংবাদ শুনিয়া কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন। পরে গণেন মহারাজকে বলিলেন, 'যদি নিবেদিতা কর্মযোগিন-এর ভার নেয় তবে আমি চন্দননগর যাইব।' তিনি তাঁহার শেষ লেখা "Open letter to my fellow citizens, my political testament" লিখিলেন এবং সেই রাত্রেই নিবেদিতার বাড়ি গিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন।' প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাও লিখেছেন যে, অরবিন্দের গ্রেপ্তারের খবর সর্বপ্রথম যোগীন মা জেনেছিলেন এবং ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ ওই সংবাদ অরবিন্দের কাছে পৌঁছে দেন।'

সতীশচন্দ্র সরকার (পরবর্তীকালে নির্বাণস্বামী) সামসুল আলম হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তবে সতীশচন্দ্র পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন, 'অরবিন্দর এই যাওয়ার পিছনে আরও একটু ইতিহাস আছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে এর মধ্যে খবর দিয়েছিলেন— সরকার ওঁকে নির্বাসিনে পাঠাবার গোপন চক্রান্ত করছে। সুতরাং এখন ভারতীয় এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াই মঙ্গল। ইতিমধ্যে সামসুল হত্যার খবরে শীগগিরই নির্বাসিনের সম্ভাবনা দেখে উনি সেই মুহূর্তেই মনস্থির করে চলে যান।' অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, নিবেদিতাই অরবিন্দকে কলকাতা ছেড়ে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরি চলে যাবার পরামর্শ দেন। তার চন্দননগর চলে যাওয়ার বিষয়ে অরবিন্দ অবশ্য স্মৃতিচারণায় বলেছেন— গ্রেপ্তারির খবর গণেন মহারাজ তাঁকে দেননি। এই সংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন কর্মযোগিন পত্রিকার এক কর্মচারী রামচন্দ্র মজুমদার। অরবিন্দ স্মৃতিচারণায় এও বলেছেন, 'দৈব আদেশ' পেয়েই তিনি চন্দননগর চলে যান। নিবেদিতার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করার সময় তিনি পাননি।'

তবে এবিষয়ে সবথেকে প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে রামচন্দ্র মজুমদারের। অরবিন্দের প্রস্থানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রামচন্দ্র অরবিন্দের সঙ্গে ছিলেন। সেই অর্থে রামচন্দ্র ছিলেন এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ১৩৫২ সালের উদ্বোধন পত্রিকায় ওই দিনটির বিবরণ দিতে গিয়ে রামচন্দ্র লিখেছেন, 'আমি জনৈক সি আই ডি-র নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে এবং খুব সম্ভব সামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ি ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে খবর দিলাম। তিনি ধীরচিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া কর্মযোগিন অফিসে আসিলেন। প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, 'নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।' আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল ... যাহা হউক, ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, — "Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things"। একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide..."। এই সংবাদ পাইয়া আমি পত্রিকা অফিসে ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন, "all right, arrange"। পরে এ সম্বন্ধে সুরেশ (সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী) যাহা লিখিয়াছেন তাহা সবই ঠিক। কেবলমাত্র গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু যে ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, এই কথা সে লেখে নাই। বোধহয় নিবেদিতার সঙ্গে তিনি কর্মযোগিন পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্তার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না। নীচে রোয়াকে বসিয়া ছিলাম। কাজেই কী কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। নিবেদিতার বাসা হইতে আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই। অরবিন্দবাবু ও বীরেনবাবু বাগবাজারে খড়ো ঘাটের সিঁড়ির উপরে বসিলেন। আমি ও মণি নৌকার সন্ধানে হাটখোলা ঘাট পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান হইতে নৌকা করিয়া বাগবাজার ঘাটে আসিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্বে অরবিন্দবাবু আমাকে বলিলেন, "Be rare in your acquaintaness. Seal your lips to rigid secrecy. Don't describe this to your nearest and dearest"।

নৌকা ছাড়িয়া দিল।'

অরবিন্দ কলকাতা ছাড়লেন, কিন্তু কর্মযোগিন-এর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন নিবেদিতার ওপর। অরবিন্দের প্রস্থানের পরও নিবেদিতার তত্ত্বধানে কর্মযোগিন প্রকাশিত হতে থাকল। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, 'কর্মযোগিন-এর শেষ সংখ্যাগুলো বেরল সম্পূর্ণ নিবেদিতার নিজ দায়িত্বে। তার মধ্যে নিবেদিতা নিজের লেখা প্রবন্ধ অরবিন্দ ঘোষের নাম দিয়ে জুড়ে দিতেন। 'কর্মযোগীর আদর্শ' প্রবন্ধটির শেষ দু অধ্যায়ও তাঁর লেখা, যোগী অরবিন্দর ভাবধারার যথাযথ সঙ্কলন তাতে। অথচ কেউ সন্দেহমাত্র করেনি।' অরবিন্দ চলে যাওয়ার পর কৌশলগত কারণেই নিবেদিতা কর্মযোগিনের কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। অরবিন্দ যতক্ষণ কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে না পৌঁছন, ততক্ষণ বিষয়টিকে গোপনই রাখতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু তবু অরবিন্দের অন্তর্ধান নিয়ে নানারকম রটনা রটল। কেউ বলল, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। কেউ বলল, অরবিন্দ সাধনার জন্য হিমালয় চলে গেছেন।

অরবিন্দের প্রকৃত আশ্রয়স্থল গোপন রাখার জন্য নিবেদিতা কর্মযোগিনে লিখলেন, 'অরবিন্দ এখানেই আছেন। তিনি সম্পূর্ণ নির্জনতার মধ্যে থাকতে চান। কাজেই তাঁর ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে।'

চন্দননগরে অরবিন্দ মতিলাল রায়ের গৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। তবে চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকার সময়ও নিবেদিতার সঙ্গে তিনি যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, চন্দননগর থেকে অরবিন্দ নিয়মিত লোক মারফৎ নিবেদিতা এবং সুকুমার মিত্রের সঙ্গে যোগযোগ রাখতেন— একথা সুকুমার মিত্রই তাঁকে জানিয়েছেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার বক্তব্য এবিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন— 'ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সঠিক তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই। তবে ১৪ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা চন্দননগরে গমন করেন। ঐদিন সরস্বতী পূজা। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হইত এবং নিবেদিতা ও কৃস্টীন সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু ঐ বৎসর ঐ দিন নিবেদিতা বেলা দেড়টায় গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া নৌকাযোগে চন্দননগর যাত্রা করেন। তখন জোয়ার ছিল। রাত্রি এগারোটায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি পুনরায় তিনি চন্দননগরে গিয়াছিলেন।' মুক্তিপ্রাণা আরও লিখেছেন, 'শ্রীঅরবিন্দের প্রস্থানের পূর্বে নিবেদিতার সহিত দেখা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। সেজন্যই নিবেদিতা ব্যস্ত হইয়া ১৪ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজার দিন চন্দননগর গিয়াছিলেন। কর্মযোগিন পত্রের পরিচালনার ব্যাপারে পরামর্শ ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দের জন্যও তিনি চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁহার ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে অবস্থানের সকল ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। আমরা কাহারো নিকট শুনিয়াছি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার পাথেয় শ্রীযুক্ত জগদীশ বসুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।' এটাই স্বাভাবিক যে, অরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার ব্যবস্থা করতে নিবেদিতার চন্দননগর যাওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। তবে তাঁর এই চন্দননগর যাত্রা নিবেদিতা যে অত্যন্ত গোপন রেখেছিলেন তাও বোঝা যায়। কোনো লেখায় নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে একটি শব্দও ব্যয় করেননি।'

অরবিন্দ চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরী চলে যান। একেবারেই একা। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমে পণ্ডিচেরি পৌঁছন অরবিন্দ। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, অরবিন্দের পণ্ডিচেরি পৌঁছানোর সংবাদে নিবেদিতা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। ১৯১০ সালের ১০ এপ্রিল নিবেদিতা ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য অরবিন্দের পণ্ডিচেরিতে অবস্থানের খবর পাঠিয়ে দেন। লিজেল রেমঁ লিখেছেন, '২ এপ্রিল কর্মযোগিন-এর আর একটা সংখ্যা বার হলো। এক সপ্তাহ পরে নিবেদিতা খবর পেলেন, অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিয়েছেন। জনাকয়েক অতিবিশ্বস্ত অনুচর অন্য পথে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলেছেন। পরদিন নিবেদিতা স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে দেশনেতার আসল ঠিকানাটা ইংরেজি কাগজওয়ালাদের জানিয়ে দিলেন।'

অরবিন্দের পণ্ডিচেরিতে অবস্থানকালে নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মনে হয়, আর কোনো যোগাযোগ তাঁদের ভিতর হয়নি। পণ্ডিচেরিতে পৌঁছে অরবিন্দ তখন বিপ্লবের পথ থেকে অনেক দূরে সাধন জগতের মানুষ। আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে অর্ধাহারে, অনটনে, নিবেদিতার শরীর তখন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। এর একবছর পর, ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর প্রয়াত হন নিবেদিতা। কিন্তু ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক উত্তাল সময়ে অরবিন্দ-নিবেদিতা যে স্বাক্ষর রেখে গেলেন— তা চিরস্মরণীয়, চিরপ্রণম্য।

তথ্যসূত্র—

১. নিবেদিতা : লিজেল রেমঁ (অনুবাদ নারায়ণী দেবী)।
২. ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।
৩. Long Journey Home : Barbara Fox।
৪. Sister Nivedita ` Pravrajika Atmaprana।
৫. Letters of Sister Nivedita ` Edited by Sankari Prasad Basu।
৬. The Complete Works of Sister Nivedita।
৭. নিবেদিতা লোকমাতা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
৮. ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ : গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।
৯. Sree Aurobinda on Himself।
১০. বাংলার বিপ্লবপ্রচেষ্টা : হেমচন্দ্র কানুনগো।
১১. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব : অমলেশ ত্রিপাঠী।
১২. দ্বীপান্তরের কথা : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।
১৩. বোমা কাহিনী : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।
১৪. দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম : সিস্টার নিবেদিতা।

# স্বাধীন ভারতের সত্তর বছর জাতীয় রাষ্ট্রের অসম্পূর্ণতা

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

"I claim not to have controlled events, but confess plainly that events have controlled me"—আব্রাহাম লিঙ্কন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন গৃহযুদ্ধের অমাবনিশা থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি হয়ে উঠেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্রাতা। তিনি না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তি ও সমৃদ্ধির দিকে এগোতে পারত না। আর আমাদের ভারতের কী পরিণতি হয়েছে? স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে স্বাধীনতা সংগ্রাম আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধের কদর্য চরিত্র ধারণ করল! মূল শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখন শত্রু নয়, সে দুই বিবদমান প্রতিপক্ষের দর কষাকষিতে ইন্ধন জোগাতে লাগল। আলাপ আলোচনা ও দরাদরি রাজনীতির পাশাখেলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব বিদ্ধ হলেন। শেষপর্যন্ত আপোশের মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর করল। একইসঙ্গে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল, মুসলমান দ্বিজাতি তত্ত্বের কাছে কংগ্রেস নতি স্বীকার করল। ব্রিটিশ ভারত দুটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হল, ভারত ও পাকিস্তান।

**দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা**

১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো। কিন্তু এ কী স্বপ্নপূরণ না নতিস্বীকার? ভারতীয় জাতীয়তার লক্ষ্য

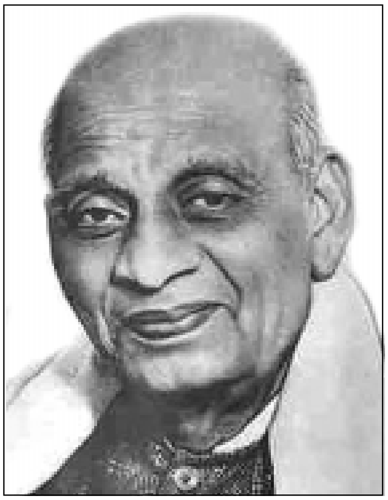

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

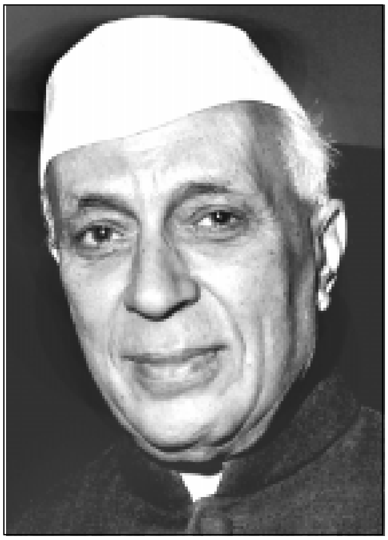

জওহরলাল নেহরু

ছিল অবিভক্ত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এর কোনাটাই বাস্তবায়িত হয়নি। একদিকে অবিভক্ত ভারত দ্বিধাবিভক্ত হলো আর অন্যদিকে স্বাধীনতার পরিবর্তে মিলল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অব্যাহত রইল। প্রায় তিনবছর পর সংবিধান কার্যকর হলে ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয় (জানুয়ারি ১৯৫০)। এদিকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'মধ্যরাতের স্বাধীনতা'কে আবাহন জানালেন তাঁর Tryst with Destiny (ভাগ্যের মুখোমুখি) বক্তৃতায়। তাঁর মতে, বিশ্ববাসী যখন নিদ্রামগ্ন তখন ভারত জেগে উঠেছে নবজীবনের স্পন্দনে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের উষাকাল কি আনন্দের বার্তায় মুখর হয়েছিল?

কেননা স্বাধীনতার পর ভারত কোন পথে এগোবে সেই বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিশা ছিল না। আপাত সংকটের ধূম্রজালে জাতীয় নেতৃবৃন্দ দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ভারত ভাগের পরিণতিরূপে দুই দেশের মানুষ হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। গান্ধীজীর অহিংসা ও শান্তির নীতি এখন বিবর্ণ অকেজো হয়ে উঠল। গৃহযুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে গান্ধীজী অনশনের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে শুভবুদ্ধির জাগ্রত করতে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু জীবন যখন অনিশ্চিত

তখন আত্মরক্ষাই একমাত্র পথ বলে মনে হল। দ্বিধাবিভক্ত পাঞ্জাব ও বাংলার ছিন্নমূল মানুষ দলে দলে সীমান্তের এপারে ও ওপারে আশ্রয়ের সন্ধানে রওনা হল। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর নৃশংস অত্যাচার চরমে উঠল।

এতো গেল স্বাধীন ভারতের আপাত সংকট। কিন্তু নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের সঠিক পথ ও পন্থা কী সে বিষয়ে জাতীয় নেতাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ কী পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে যান্ত্রিকভাবে এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্মাণ? পাশ্চাত্য মডেল কি আমরা অনুসরণ করবো? শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, আমরা পাশ্চাত্যকরণের চোরাগলিতে প্রবেশ করবো না। আমরা ভারতের সুমহান অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার উপর নতুন ভারতের সৌধ গড়ে তুলব। তাঁর ভাষায়, "We must know our past and recover it for the purpose of our future. Our business is to realise ourselves first and to mould everything to the law of India's eternal life and nature"।

স্বাধীনতার পর প্রথম তিন বছরে (১৯৪৭-৫০) ভারত যে দুটি ক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রের সৌধ নির্মাণে সফল হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভূমিকা ছিল নেহাতই নগণ্য। প্রথমটি হল পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের দ্রুত ভারতভুক্তি। এ বিষয়ে ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ ও সদর্থক। দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সচিব ভি পি মেননের সহযোগিতায় দ্রুততালে সংযুক্তিকরণের চুক্তি বলবৎ করে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে সংযুক্ত করেন। হায়দরাবাদের নিজাম ও জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের চক্রান্ত করেছিলেন। হায়দরাবাদের পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সশস্ত্র রাজাকারদের তাণ্ডব ক্রমশ বেড়ে উঠছিল। তাই শেষপর্যন্ত পুলিশ অভিযানের মাধ্যমে হায়দরাবাদের ভারতভুক্তি সম্পন্ন হল (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)। আর গণভোটের মাধ্যমে জুনাগড় ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হল। কিন্তু কাশ্মীরের পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। সেখানকার রাজা হরি সিংহ প্রথমে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের চুক্তিপত্রে সই করেননি। এর সুযোগে পাকিস্তান হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীর গ্রাস করতে ধাবমান হয়। শেষপর্যন্ত অক্টোবরের শেষদিকে (১৯৪৭) হরি সিংহ ভারতের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ পত্রে স্বাক্ষর দিলেন। কিন্তু ততদিনে পাকিস্তান কাশ্মীরের বিশাল এলাকায় থাবা বসিয়েছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নেহরু দুটি বড় ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছেন। তিনি কাশ্মীরের জাতীয় কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লার প্রতি আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি হরি সিংহকে উৎখাত করে শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের পরিচালক করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, নেহরু সক্রিয় প্রতিরোধ নীতিতে আস্থা না রেখে বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নিয়ে গেলেন। এভাবে কাশ্মীর সমস্যা একটি আঞ্চলিক সংঘাত থেকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির জালে আবদ্ধ হল। নেহরুর ভ্রান্তির ফলেই ১৯৮০ সালের শেষদিক থেকে কাশ্মীর জেহাদি উগ্রপন্থী রাজনীতির পীঠস্থানে পরিণত হয়। আজও তার মাশুল দিতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হল স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়ন। সংবিধান সভা একটি খসড়া রচনা কমিটি গঠন করে। এর দায়িত্বে ছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। তাছাড়া গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে এম মুন্সী, বি এন রাও প্রমুখ সদস্যের কর্মকুশলতায় ভারতের সংবিধান রচনার কাজ সুসম্পন্ন হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। সর্দার প্যাটেল ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস দলের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। এরপর নেহরু কংগ্রেস দলের উপর তাঁর অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হলেন। কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরে গেলেন। নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হলেন। দল ও রাষ্ট্রের উপর তাঁর চরম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

### নেহরু আমলের পর্যালোচনা

১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিন পুরুষ ধরে একটা দেশের রাজ্যপাট, পরিচালনার দায়িত্ব নেহরু ও তাঁর বংশধরদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সে বছর জাতীয় কংগ্রেস কংগ্রেস দলের শতবর্ষ সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করে। সেই গ্রন্থে নেহরু ও তাঁর পরিবারের ভূমিকাকে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নেহরুর আমলে তিনিই ছিলেন দেশ ও জাতির মহান নেতা, আর তাঁর কন্যা ইন্দিরা ছিলেন প্রধান নেত্রী।

নেহরু ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। নেহরু আমলকে 'সোনালি যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নেহরু স্বাধীন ভারতের নয়া অবতার বলে বন্দিত হয়েছেন। তিনটি ক্ষেত্রে নেহরুর ভূমিকা পর্যালোচনা প্রয়োজন। তাঁর সময়ে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের সৌধ রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস লোকসভায় ৪৬৯টি আসনের মধ্যে ৩৫৪টি আসনে জয়যুক্ত হয়। রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনেও নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস ৪৮৩টি আসনের মধ্যে ৩৬৬টিতে জয়যুক্ত হয়। রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রইল। তবে ব্যতিক্রম ছিল কেরল। সেখানে ই এম এস

নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বছর দুয়েক পর সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হয়।

প্রশ্ন হল, নেহরু সংসদীয় গণতন্ত্রের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে কতটা যত্নবান ছিলেন? জয়প্রকাশ নারায়ণ খোলাখুলি জানালেন, নেহরু নিছক কংগ্রেস দলের নেতা, তিনি বাস্তবক্ষেত্রে জাতীয় নেতার স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেননি। ক্ষমতার সুবাদে কংগ্রেস নেতারা বৈভবে দিন যাপন করছিলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৯৬৩ সালে নেহরু কংগ্রেস সভাপতি কে কামরাজকে দিয়ে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বলা হল, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে সাংগঠনিক কাজে অংশ নেবেন। কিন্তু এতে কাজের কাজ তেমন হয়নি।

নেহরুর অবদান প্রসঙ্গে দুটি বিষয় জোরালোভাবে প্রচার করা হয়। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র নেহরুকে আধুনিক ভারতের রূপকার বলেছেন। ১৯৪৮ সালে শিল্পনীতি ঘোষণা করে বলা হলো, দেশের অর্থনীতির প্রধান দিকগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসবে। এরপর ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হল। পরিকল্পিত অর্থনীতির আয়োজন শুরু হলো। ভারী শিল্প স্থাপনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অগ্রাধিকার পেল। সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নীতি ঘোষিত হল। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ সুসংহত চরিত্র পায়নি। শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় কৃষি অর্থনীতির অগ্রগতি ব্যাহত হলো। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে নেহরু বিশ্বশান্তির দূত রূপে নিজেকে জাহির করলেন। পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলন এসবের মাধ্যমে নেহরু যুদ্ধের আঘাত থেকে বিশ্বশান্তি রক্ষার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলেন। কিন্তু এর ফলে ভারতের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়নি। পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আর ভারতের বৃহৎ প্রতিবেশী চীন ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করল। ১৯৫৯ সাল থেকেই চীন ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন শুরু করে। এরপর ১৯৬২ সালে চীন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হয়।

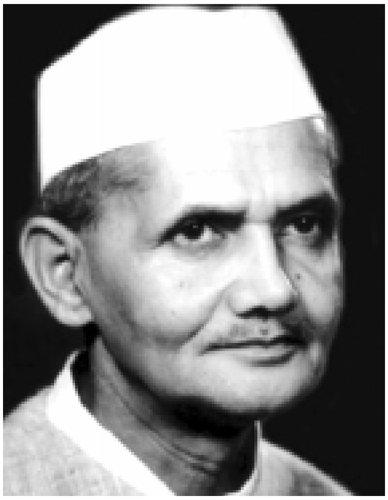

*লালবাহাদুর শাস্ত্রী*

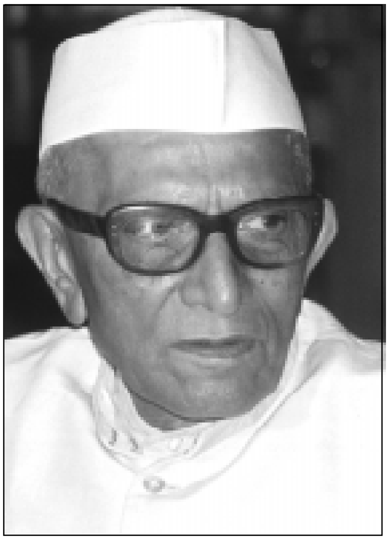

*মোরারজী দেশাই*

শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াল? ঐতিহাসিক এস গোপাল নেহরুকে 'হতাশাগ্রস্ত অবতার' বলে মন্তব্য করেছেন। ১৯৬২ সালের পরেই নেহরুর ভাবমূর্তি মলিন হয়ে পড়ে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন ছিলেন নেহরুর প্রিয় পাত্র। তাঁকে মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিতে হলো।

**লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কর্মযজ্ঞ**

১৯৬৪ সালের ২৭ মে নেহরু প্রয়াত হলেন। প্রধানমন্ত্রী পদে লালবাহাদুর শাস্ত্রী সর্বসম্মতভাবে মনোনীত হলেন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে লালবাহাদুর ঘোষণা করলেন যে, তিনি নেহরুর নীতি অনুসরণ করবেন। কিন্তু মাত্র দেড় বছরের মধ্যে লালবাহাদুর তাঁর বাস্তববাদী কর্মপন্থা রূপায়নে অভাবনীয় সাফল্য পেলেন। তাঁর শ্লোগান ছিল 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'। লালবাহাদুর বুঝেছিলেন দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে— একটি কৃষি অর্থনীতি আর অন্যটি সামরিক শক্তি। এই দুটি দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সি সুব্রহ্মণ্যম ও যশোবন্তরাও চ্যবনকে। এই সময় কৃষি ক্ষেত্রে ধস নেমেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু স্বয়ম্ভর কৃষি অর্থনীতি না গড়ে তুলতে পারলে বিপর্যয় নেমে আসবে। এই পরিস্থিতিতেই সি সুব্রহ্মণ্যম সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চ্যবন চীনের আক্রমণের পর থেকেই ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো ঢেলে সাজান। এরই সুফল মিলল ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের সময়। পাকিস্তান ভারতের পাল্টা প্রতিরোধে কাবু হয়ে পড়ল।

ভারতীয় জওয়ানরা লাহোর অভিমুখে এগিয়ে গেল। জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হল। শেষপর্যন্ত তাশখণ্ডে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলো। দুঃখের বিষয়, তাশখণ্ডে ঘোষণার পরেই শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তবে শাস্ত্রী স্বল্প প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে জাতীয় বীরের মর্যাদা পান। শাস্ত্রী আরও কিছুকাল জীবিত থাকলে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় বসতেন না, ইতিহাসের গতি অন্যপথে মোড় নিত।

## কংগ্রেস ভাঙন ও স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি

১৯৬৭ সাল চতুর্থ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতা সংকুচিত হলো। কেন্দ্রে ৫২০টি আসনের মধ্যে ২৮৪টিতে কংগ্রেস জয়লাভ করে। বিরোধী দলগুলির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। জনসঙ্ঘ ৩৫টি আসনে বিজয়ী হয় আর স্বতন্ত্র পার্টি ৪৪টি আসন দখলে আনে। রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় ধস নামল। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলো। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও হরিয়ানায় জনসঙ্ঘ প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেল। কংগ্রেস দলের নির্বাচনী ব্যর্থতার পাশাপাশি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠল। সিন্ডিকেট নামে প্রভাবশালী গোষ্ঠী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে কোণঠাসা করতে সচেষ্ট হলো। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেনের আকস্মিক প্রয়াণে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ড নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করল। ইন্দিরা গান্ধী অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেড্ডিকে সমর্থন জানালেন। অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ উপরাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরিকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করল। শেষ মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী বিবেক ভোটের আহ্বান জানালেন। ইন্দিরা সমর্থকদের ভোটের সুবাদে শ্রী গিরি রাষ্ট্রপতি পদে বিজয়ী হলেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হলেন। এরপর কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ইন্দিরাকে দল থেকে সাসপেন্ড করল। ইন্দিরা অনুগামীদের নিয়ে পাল্টা সংগঠন গড়লেন। এইভাবে ১৯৬৯ সালের শেষদিকে কংগ্রেস (সংগঠন) ও ইন্দিরা গোষ্ঠীর কংগ্রেস (শাসক) নামে দুটি সমান্তরাল দলীয় মঞ্চ গড়ে উঠল। এরপর দ্রুততালে ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করে চমক সৃষ্টি করলেন। ইন্দিরা সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও বাম দলগুলির সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে রইল। 'গরিবি হটাও'-এর জনমোহিনী ধ্বনি তুলে ইন্দিরা ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক আসনে জয়যুক্ত হলেন। সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র দলগুলির আসন সংখ্যা কমল।

১৯৭১ সালে লোকসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর শুরু হল পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনার গণনিধন যজ্ঞ। ভারতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল প্রায় এক কোটি শরণার্থী। শেষপর্যন্ত ভারতের সক্রিয় প্রতিরোধ নীতির ফলে পাক সেনা আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর বলিষ্ঠ ভূমিকা দেশবাসীকে উদ্বেলিত করেছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠার পরেই মাত্র দু-বছরের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি মলিন হয়ে ওঠে। লোকনায়ক জয়প্রকাশের আহ্বানে বিহার ও গুজরাটে প্রবল গণবিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের জুনে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে দুর্নীতির অভিযোগে ইন্দিরা গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হলেন। ইন্দিরার পদত্যাগের দাবিতে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জরুরি অবস্থা ঘোষিত হল। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ যথা জয়প্রকাশ, মোরারজী দেশাই, অটলবিহারী বাজপেয়ী সমেত এক লক্ষ মানুষ কারাবন্দি হলেন। বিনা বিচারে আটক আইনের (মিসা) অপব্যবহারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থমকে গেল। স্বৈরতন্ত্রের দাপটে সারা বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হলো। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়। কিন্তু জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে আর এস এস কর্মীদের আন্দোলন ছিল স্মরণীয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বি ভি পি প্রেসিডেন্ট অরুণ জেটলি ও অন্যান্য সক্রিয় কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। নরেন্দ্র মোদীর মতো তরুণ সংগঠক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গণতন্ত্র নিধন পর্ব উনিশ মাস চলেছিল। তারপর ১৯৭৭ সালের মার্চে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে জনসঙ্ঘ, লোকদল, সংগঠন কংগ্রেস প্রভৃতি বিরোধী দলগুলি একত্রিত হয়ে জনতা পার্টি গঠন করে। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটে। ইন্দিরা ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় (অসাংবিধানিক ক্ষমতার উৎস) দুজনেই পরাজিত হলেন। জনতা পার্টি ও সহযোগী দলগুলি ৩৩০টি আসনে জয়ী হল। মোরারজী দেশাই ভারতের প্রথম অকংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন। স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় ও গণতন্ত্রের বিজয় নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় দিকচিহ্ন। জনসঙ্ঘ নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানী মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পেলেন। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের বিভাজন হল। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কংগ্রেস (আই) দল গঠন করলেন। দুঃখের বিষয়, জনতা পার্টির নেতাদের মধ্যে বিরোধ প্রকট হয়ে উঠল। মোরারজী পদত্যাগ করলেন (জুলাই ১৯৭৯) এবং চরণ সিং ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হলেন। কিন্তু কংগ্রেস সমর্থন তুলে নেওয়ায় পুনরায় নির্বাচন হলো। এবার ইন্দিরা কংগ্রেস ৩৫৩টি আসনে জয়ী হলো। ইন্দিরা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হলেন। ইতিমধ্যে ১৯৮০ সারের ৬ এপ্রিল জনতা পার্টির জনসঙ্ঘ গোষ্ঠী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো। বিজেপির প্রতিষ্ঠা ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত করল। ইন্দিরার দ্বিতীয় দফার শাসনে পাঞ্জাবে শিখ উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। উগ্রপন্থী দমনে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযান চালানো হয়। শিখ উগ্রপন্থীদের গুলিতে ইন্দিরার জীবন নাশ হয় (৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪)। সেদিনই ইন্দিরাপুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন।

ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস সহানুভূতি পাওয়ায় লোকসভার নির্বাচনে ৫৪১টি আসনের মধ্যে ৪১৫টি আসনে জয়লাভ করে। এতটা সাফল্য কংগ্রেস ইতিপূর্বে কখনো

পায়নি। বিরোধী পক্ষ একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। এদিকে উত্তেজিত জনতা মারমুখী হয়ে শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। প্রায় তিনহাজার শিখকে হত্যা করা হয়। রাজীবের সময় প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের কর্মসূচী গৃহীত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা বহাল থাকে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের শতবর্ষে রাজীব গান্ধী কংগ্রেস দলকে তোষামুদে সুবিধাভোগী মানুষের মঞ্চ বলে ভর্ৎসনা করেন।

আশির দশকের শেষদিক থেকে তিনটি নেতিবাচক প্রবণতা ভারতীয় রাজনীতিতে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে সংখ্যালঘু তোষণের চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে। শাহবানু মামলার রায় নস্যাৎ করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মৌলবাদী মুসলিমদের কাছে নতি স্বীকার করলেন। দ্বিতীয়ত, জাতপাতের রাজনীতি ও আঞ্চলিকতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। যুক্তফ্রন্ট, ফেডারেল ফ্রন্ট এসব স্লোগানের আড়ালে আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করতে চাইল। তৃতীয়ত, আশির দশকের শেষ থেকেই কাশ্মীরে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির সন্ত্রাস তীব্র হয়ে ওঠে। ভারতের ভেতরের মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীদের সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলি যৌথভাবে তাণ্ডব শুরু করে। ১৯৯৯ সালে পাক সেনাদের অভিসন্ধি দূর করার জন্য বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কার্গিল যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গি সংগঠনগুলি নাশকতামূলক কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে। ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের ভয়াবহ হামলা সমগ্র বিশ্বের নজর কেড়েছিল।

এদিকে ১৯৯১ সালের মে মাসে কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধী নির্বাচনে প্রচারের সময় তামিল উগ্রপন্থীদের বোমায় নিহত হলেন। এই ঘটনায় কংগ্রেস আবার সহানুভূতি ভোটের সুবাদে লোকসভায় ২৩২টি আসন পায়। ভারতীয় জনতা পার্টি এই প্রথম ১২০টি আসনে জয়যুক্ত হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবল শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করল। লালকৃষ্ণ আদবানীর নেতৃত্বে বিজেপি রামজন্মভূমি আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত দেশে তুমুল জনসমর্থন পায়। ১৯৯১ সালে পি ভি নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে ভারতে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে। শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নেহরুর আমলে গৃহীত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে মুক্ত অর্থনীতির দ্বার উন্মোচিত হলো। এতদিন লাইসেন্স পারমিট ব্যবস্থার রমরমা ছিল, এর ফলে

*ইন্দিরা গান্ধী*

দুর্নীতির পাহাড় জমতে থাকে। নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় এর দাপট হ্রাস পেল। জিডিপি-র পরিমাণ অনেকটা স্থিতিশীল হলো। নরসিংহ রাও প্রথম দক্ষিণ ভারতীয় ও প্রথম নেহরু-পরিবার বহির্ভূত নেতা, যিনি টানা পাঁচ বছর দল ও সরকারের শীর্ষে ছিলেন। ১৯৯৬ সালের পর পরিবারতন্ত্রের সমর্থকদের কারসাজিতে তিনি পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন।

১৯৯৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কেন্দ্রে একদলীয় সরকারের পরিবর্তে মোর্চা সরকারের সময় বহাল থাকে। প্রথমে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত পরপর দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসের সমর্থনে ক্ষমতায় বসে। দেবেগৌড়া ও ইন্দ্রকুমার গুজরাল পর্যায়ক্রমে প্রধানমন্ত্রী হলেন। মজার কথা হল, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি ভারতের সর্ববৃহৎ দলের মর্যাদা পায়। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দু-সপ্তাহ বিজেপি ক্ষমতায় বসে। কিন্তু বিজেপি বিরোধী অন্যসব দলগুলি সুবিধাবাদী আঁতাত করে। কিন্তু ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল কংগ্রেসের হাতে। তাই সমর্থন প্রত্যাহার করে প্রথমে দেবেগৌড়া ও পরে গুজরালকে উৎখাত করে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাগ্যের পরিহাস, ১৯৯৬ সালে বিজেপিকে অচ্ছুত করে ঠেলে দিলেও অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এন ডি এ জোট ভারতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় বাজপেয়ী যে কুশলতা দেখিয়েছিলেন তা দেশবাসীর মনে রেখাপাত করেছিল।

কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে টানা দশবছর কংগ্রেসের নেতৃত্বে পাল্টা জোট সরকার ক্ষমতা ভোগ করে। ইউ পি এ সরকার নামে পরিচিত এই জোট সরকার ছিল অপশাসন তথা কুশাসনের নামান্তর। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু আর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ছিলেন অনুগত মুখ্য প্রশাসক। এতদিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দেশ ও জাতির মুখপাত্র। এখন তিনি একজন প্রশাসক মাত্র। এদিকে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলির কর্তাব্যক্তিরা নানারকম দুর্নীতির জালে আবদ্ধ হলেন। কমনওয়েলথ গেমস থেকে কয়লা কেলেঙ্কারি সর্বত্র দুর্নীতির হদিশ মিলল। স্থিতপ্রজ্ঞ মনমোহন সিংহ সবই শোনেন, দেখেন, বলেন না কিছুই। ইতিমধ্যে প্রথম ইউ পি এ সরকারের সময় সহযোগী বাম দলগুলি ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে শোরগোল তুলল এবং সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করল। দ্বিতীয় ইউ পি

এ সরকারের সময় সহযোগী দল তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন তুলে নেয়।

**দেশনায়ক নরেন্দ্র মোদী**

তাই মানুষের প্রত্যাশা হলো স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় প্রশাসন। আঞ্চলিক দলগুলির দরকষাকষি দেশের রাজনীতিকে খাদের কিনারে দাঁড় করিয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে বিজেপি নেতৃত্ব এন ডি এ জোট ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়। বিজেপি একাই ২৮২টি আসনে জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলেন (মে ২০১৪)। তারপর তিন বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত। একের পর এক সাহসী ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে মোদী সরকার জাতীয় সুরক্ষা ও সুশাসনের লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে চলেছে। বিজেপি ভারতের প্রধান দলে পরিণত হয়েছে। ১৯৫১ সালে জনসঙ্ঘ ও ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনতা পার্টি আজ ভারতের রাজনীতির ভরকেন্দ্র। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও বিমুদ্রীকরণের মতো সাহসী পদক্ষেপ সমগ্র দেশকে নাড়া দিয়েছে। কায়েমি স্বার্থের রাজনীতি নয়, দেশের বিকাশ সরকারের মূল মন্ত্র। বোধকরি রবীন্দ্রনাথের সেই উদাত্ত বাণী চলার পথে একমাত্র দিশা হয়ে উঠেছে—

> “ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
> নীরব হয়ে, নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ
> মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরে দিয়ো
> কঠিন পরিচয়।”

# কাকলি

**রমানাথ রায়**

যাহ্! ফটিক মারা গেল। মারা গেল হার্ট ফেল করে। অথচ কী এমন বয়স হয়েছিল! আমার বন্ধু ছিল ফটিক। আমারই বয়সী। আমার বয়স তিরিশ বছর, ওর বয়সও ওইরকমই। বড়জোর একবছর এদিক-ওদিক হবে। তবে মরে ও বেঁচেছে। বেঁচে থাকার দুর্ভোগ থেকে বেঁচেছে। কারণ যে অফিসে কাজ করত সে অফিসে কাজের চাপ ছিল খুব। ও আর পারছিল না। তাই কখনও বলত, আর পরিছি না। এ অফিসটা ছেড়ে দেব ভাবছি। কখনও বলত, এবার মরে গেলে বাঁচি। এই অফিস আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত ফটিক মরে গিয়ে নিজে বাঁচল। কিন্তু স্ত্রীকে বিপদে ফেলে গেল। ওর স্ত্রীর নাম কাকলি। স্বামীর মৃত্যুতে সে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ল। রাতদিন চোখের জল ফেলতে লাগল। তার চোখের জল যত না ফটিকের জন্য, তার চেয়ে বেশি নিজের জন্য। সে কিছুতেই ভেবে পেল না এবার সে কী করবে, কী ভাবে বাঁচবে। বুঝে পেল না তার দিন কীভাবে কাটবে। অন্য মেয়ে হলে এইসময় বাপের বাড়ি গিয়ে উঠত। কিন্তু তার বাবা-মা বেঁচে নেই। ভাই-বোন বলতেও কেউ নেই। সে তাই দিনরাত ভাবতে লাগল কী করা যায়। কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাওয়া যায়।

ফটিকের একমাত্র বন্ধু ছিলাম আমি। কাকলি সেকথা ভালো করেই জানত। তাই একদিন আমার কাছে এসে হজির হল।

আমি কাকলিকে সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর? কেমন আছ?

ম্লান মুখে কাকলি বলল, ভালো নেই।

বললাম, না থাকারই কথা। কিন্তু কী করবে বলো। ফটিক যে এভাবে হঠাৎ মারা যাবে তা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। ফটিক ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। তাই ও মরে গেলে আমি একা হয়ে গেছি। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়।

কাকলি বলল, আমারও হয়। ও আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেল। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিল। তাও প্রায় শেষ হতে বসেছে। কী এখন করব বুঝতে পারছি না। তুমি আমার জন্য একটা কিছু করো।

— কী করব?

— আমি বি-এ পাশ। আমার জন্য একটা যদি চাকরি জোগাড় করে দাও তাহলে আমার খুব উপকার হয়। আমি তোমার কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

—কিন্তু এ বাজারে চাকরি পাওয়া খুব কঠিন।

— তা জানি। তবে তোমার তো অনেক জানাশুনা। তুমি যদি একটু চেষ্টা করো তাহলে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা হবে।

— কোনো কথা দিতে পারছি না। তবে আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। — বলে আমি আলমারি খুলে এক হাজার টাকা কাকলির হাতে তুলে দিলাম। দিয়ে বললাম, এখন এটা রেখে দাও। তারপর আবার দরকার হলে বোলো। আমি যতটুকু পারি সাহায্য করব। তুমি চিন্তা করো না।

কাকলি টাকাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আজ আসি।

বললাম, এসো।

কাকলির জন্য একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কী করব? আমার মাথায় কিছু এল না। একটা চাকরি পেলে ওর খুব ভালো হয়। অথচ কোথাও ওর জন্য কোনো চাকরি নেই। আমার অফিসের বড়বাবুকে অনুরোধ করেছিলাম। বড়বাবু আমার অনুরোধ উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমি আমার মামার মেয়ের জন্য কিছু করতে পারছি না। আর আপনি কোথাকার কে এক কাকলির জন্য আমাকে অনুরোধ করছেন। তারপর আমি চুপ করে গেছি। আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিনি। আমি এবার আমার এক বন্ধুর কাকার কাছে গেলাম। বন্ধুর কাকাকে চাকরির কথা বললাম। কাকা এক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি কাকলির দুরবস্থার কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর আমাকে তার অফিসে যেতে বললেন। আমি কাকলিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অফিসে গেলাম। তিনি কাকলিকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য রামমোহন রায়ের ওপর ইংরেজিতে দশটি বাক্য লিখতে বললেন। কাকলি তা লিখল,। কাকা তা পড়ে খুশি হলেন। তারপর বাংলায় শরৎচন্দ্রের ওপর দশটি বাক্য লিখতে বললেন। কাকলি তা লিখল। কাকা তা পড়ে খুশি হলেন। হেসে বললেন, ঠিক আছে। তোমরা এখন এসো। ভেবে দেখি কী করা যায়। তারপর আমরা চলে এলাম। আমি কাকলিকে বললাম, কাকা তোমার লেখা পড়ে খুশি হয়েছেন। মনে হচ্ছে এখানে তোমার চাকরি হয়ে যেতে পারে। কাকলি আমার কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, সতি?

আমি বললাম, আমার তাই মনে হচেছ।

কিন্তু দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ গেল। দু-সপ্তাহ গেল। কাকার কাছ থেকে কোনো খবর পেলাম না। তাই শেষে আমি কাকার অফিসে গেলাম। কাকার সঙ্গে দেখা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কাকলির চাকরির কী হল?

কাকা বললেন, সবই ঠিক আছে। কিন্তু...

কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম, কী?

— কাকলির গায়ের রঙটা একটু ফর্সা হলে ভালো হতো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গায়ের রঙের সঙ্গে চাকরির কী সম্পর্ক আছে?

কাকা বললেন, আছে, আছে।

জানতে চাইলাম, কীরকম?

— এই পত্রিকার মালিক তো আমি নই। মালিক অন্যজন। তিনি একটু ফর্সা রঙের মেয়েদের পছন্দ করেন। এছাড়া...

— এছাড়া কী?

— এছাড়া মনে হল কাকলির পেটে চর্বি জমেছে। মুখশ্রী— খুব একটা সুবিধের নয়।

এবার আমি রেগে গিয়ে বললাম, এসব কী বলছেন আপনি? কাকলি এখানে রূপ দেখাতে আসবে না। আসবে চাকরি করতে। এখানে দরকার যোগ্যতা।

— যোগ্যতা বলতে আমরা শুধু দক্ষতাকে বুঝি না। মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা রূপটাকেও যোগ্যতা বলে ধরি।

আমার আর কিছু বলার নেই। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম এক মিনিট। তারপর বললাম, আসি।

কাকা এই সময় আমাকে বললেন, মন খারাপ করো না। কাকলি যেন তার গয়ের রংটা ফর্সা করার চেষ্টা করে। পেটের চর্বিটাও যেন কমিয়ে ফেলে। আর যেন মুখশ্রীটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করে। বুঝেছ?

— বুঝলাম।— বলে আমি কাকার কাছ থেকে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় পা দিয়ে আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের রূপটা যে একটা যোগ্যতা তা আমার জানা ছিল না। আজ জানলাম। কিন্তু কাকলিকে গিয়ে কী বলব? কী করে বলব তাকে দেখতে ভালো নয় বলে চাকরি হলো না। না, একথা বলা যায় না।

বললে কাকলি কষ্ট পাবে। আমি তাই কাকলির সঙ্গে দেখা করলাম না। তাকে এড়িয়ে চলেত লাগলাম। কাকলি আমাকে মোবাইলে ফোন করতে লাগল। আমি তার ফোন ধরলাম না। শেষে থাকতে না পেরে কাকলি একদিন আমার ফ্ল্যাটে চলে এল। আমাকে জিজ্ঞেস করল, চাকরির কী হল?

এবার সত্যি কথাটা বলতে হলো। বললাম, তোমাকে দেখতে ভালো নয় বলে চাকরি হয়নি। তবে চিন্তা করো না, আমি তোমার চাকরির জন্য আর একজনের সঙ্গে কথা বলব।

কাকলি জানতে চইল, লোকটা কে?

বললাম, একজন মন্ত্রী।

লেখাপড়া বিশেষ কিছু শেখেননি। তাই তাঁকে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী করা হয়েছে। তার কাজ মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক উৎসবে ভাষণ দেওয়া। তিনি যেহেতু বঙ্গ সংস্কৃতির বিশেষ কিছু জানেন না, তাই তাঁর জন্য আছে একজন সেক্রেটারি। তিনিই ভাষণ লিখে দেন। কিন্তু সেই ভাষণেও মাঝে মাঝে বিচ্ছিরি রকমের ভুল ধরা পড়ে। প্রায়ই ভাষণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনা রবীন্দ্রনাথের নামে চালান। রবীন্দ্রনাথের রচনা শরৎচন্দ্রের নামে চালান। এ নিয়ে খবরের কাগজে সমালোচনা করা হয়। তাই তিনি একজন যোগ্য সেক্রেটারি খুঁজছিলেন। মন্ত্রী আমাদের পাড়াতেই থাকেন। আমি একদিন কাকলিকে নিয়ে মন্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

আমি বললাম, স্যার, আপনি নাকি একজন যোগ্য সেক্রেটারি খুঁজছেন?

মন্ত্রী বললেন, হ্যাঁ।

— আমি একজন যোগ্য সেক্রেটারি এনেছি।

— কে? এই মহিলা?

— হ্যাঁ, স্যার।

— কী নাম?

— কাকলি গুহ।

— কী পাশ?

— বি-এ।

মন্ত্রী এবার কাকলিকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাষণ ঠিক করে লিখতে পারবে?

কাকলি বলল, পারব স্যার।

— বলো তো দেখি গীতাঞ্জলি কার লেখা?

— রবীন্দ্রনাথের।

— চমৎকার।

— এবার বলো তো ‘চরিত্রহীন’ কার লেখা?

— শরৎচন্দ্রের।

— ঠিক বলছ তো?

— আমি

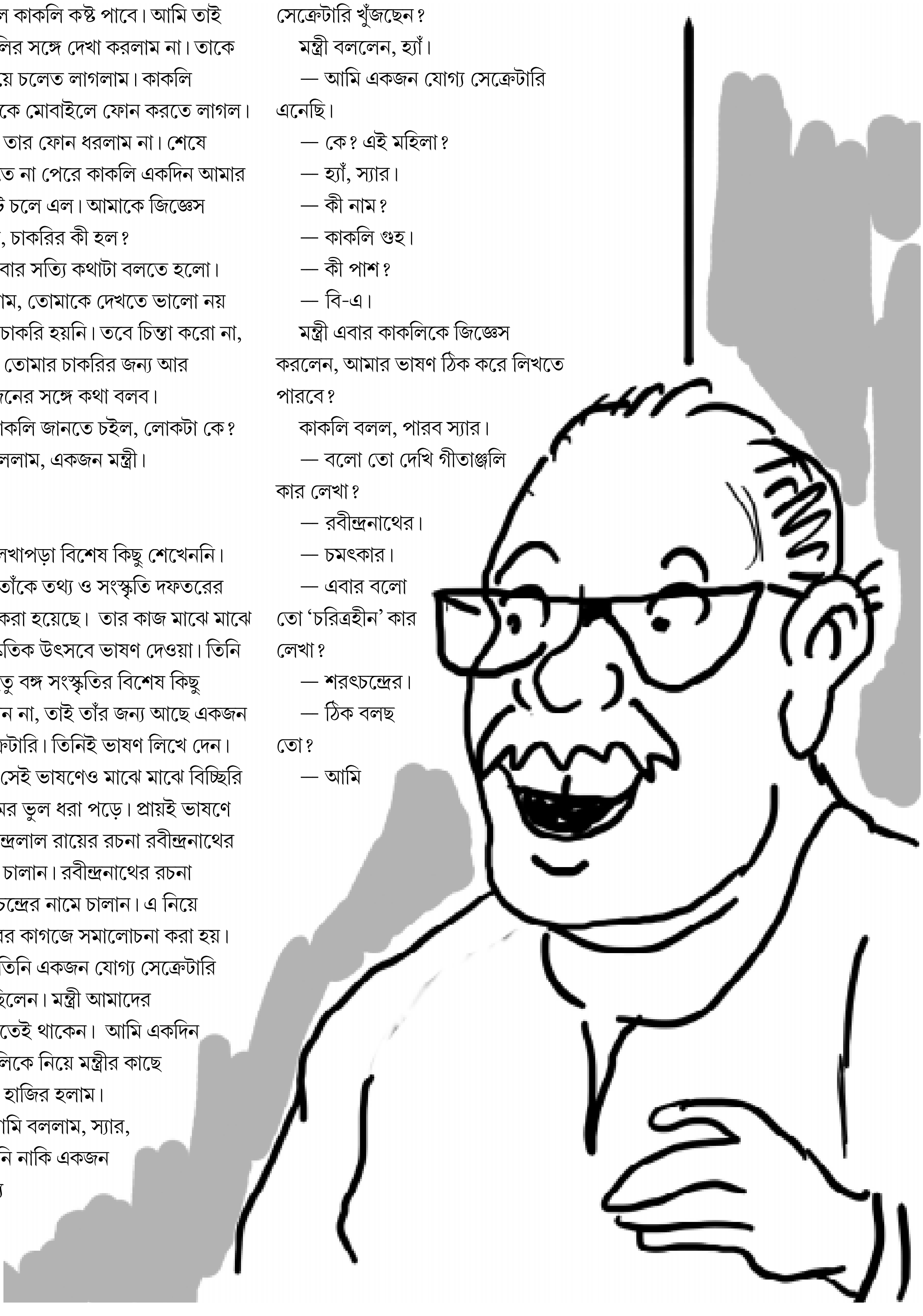

এবার কাকলিকে সমর্থন করে বললাম, ঠিক বলেছে স্যার।

— সত্যি?

— সত্যি।

— তাহলে এবার বলো তো 'মেঘনাদ বধ' কাব্য কার লেখা?— বলে মন্ত্রী কাকলির দিকে তাকালেন।

কাকলি বলল, মধুসূদন দত্তর।

মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হয়নি। এটা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা।

কাকলি অবাক হয়ে মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। বললাম, না স্যার। মেঘনাদ বধ কাব্য মধুসূদন দত্তর লেখা। কাকলি ঠিকই বলেছে।

মন্ত্রী আমার ওপর রেগে গেলেন। বললেন, তুমি আমার থেকে বেশি জানো?

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, না স্যার। আপনি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী। আমি আপনার থেকে বেশি জানি না। তবে এটা আপনি ঠিক বলেননি।

মন্ত্রী বললেন, ঠিক আছে। তোমরা এখন এসো।

আমি তা শুনে জানতে চাইলাম, কাকলির চাকরিটা কী হবে স্যার?

মন্ত্রী বললেন, আমি তোমাকে ফোন করে জানাব। তোমার ফোন নম্বরটা দিয়ে যাও।

আমি একটা কাগজে আমার নাম আর ফোন নম্বর লিখে মন্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। মন্ত্রী কাগজটা তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিলেন। দিয়ে বললেন, আমার ফোন নম্বর তোমার কাছে আছে তো?

— আছে।

— তাহলে আমি যদি তোমাকে ফোন করতে ভুলে যাই তাহলে তুমি আমাকে ফোন করো।

— আচ্ছা। — বলে আমি কাকলিকে নিয়ে মন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

তারপর পনেরো দিন কেটে গেল। মন্ত্রীর ফোন পেলাম। না। তখন আমি নিজেই মন্ত্রীকে ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, কাকলির চাকরির ব্যাপারে কী ঠিক করলেন?

মন্ত্রী বললেন, কাকলির সব ভালো। কিন্তু ওকে দেখতে ভালো নয়। আমি সুন্দরী সেক্রেটারি চাই। যদি তোমার হাতে কোনো সুন্দরী মেয়ে থাকে তাহলে বোলো।

আমার আর কিছু বলার নেই। কথা না বাড়িয়ে ফোনের লাইন কেটে দিলাম। আমি কাকলিকে এবিষয়ে কিছু জানালাম না।

কাকলি একদিন জিজ্ঞেস করল, আমার চাকরির কী হল?

বললাম, হয়নি।

— কেন?

— তোমাকে নাকি দেখতে ভালো নয়।

এখন কাকলির বেঁচে থাকার একটা রাস্তাই খোলা। সেটা হল বিয়ে করা। বিয়ে করলে আর কোনো ভাবনা থাকবে না। আমি কাকলিকে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু বন্ধুর স্ত্রীকে বিয়ে করতে মন চায় না। বিয়ের পর প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কাকলি ফটিকের বউ ছিল। কাকলিরও প্রতিমুহূর্তে মনে পড়বে ফটিকের কথা। তাই অন্য ছেলের সঙ্গে কাকলির বিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু রোজগেরে ভালো ছেলে পাব কোথায়? তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তার আগে কাকলির মত নেওয়া দরকার। জানা দরকার কাকলি আদৌ বিয়ে করতে চায় কিনা। ও যদি বিয়ে করতে না চায়, তাহলে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। তাই একদিন ওকে ফোন করলাম। ফোন বন্ধ। কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। না পেয়ে আবার ফোন করলাম। এবারেও কোনো রিং টোন নেই। কী ব্যাপার! ফোন খারাপ হয়ে গেল নাকি? হতেই পারে। আমি তাই অনেক ভেবেচিন্তে কাকলির ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। ফ্ল্যাটে তালা দেওয়া। কোথায় গেল কাকলি? যাবার আগে আমাকে কিছু জানাল না কেন? পাশের ফ্ল্যাটে ডোরবেল বাজালাম। একজন মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকলি কোথায় গেছে জানেন?

মহিলা বললেন, ফটিকের এক মামা থাকেন আমেরিকায়। তিনি এসে ওকে আমেরিকা নিয়ে গেছেন।

— কাকলি কবে ফিরবে?

— কিছু বলে যায়নি।

আমি তারপর আর কথা না বলে চলে এলাম। এটা সবদিক থেকে ভালো হলো। ফটিকের মামা নিশ্চয় ভালো চাকরি করেন। ফলে কাকলির কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু তাই নয়, একটা সাধারণ চাকরিও জুটিয়ে দিতে পারবেন। দরকার মনে করলে কাকলি ওখানকার কাউকে বিয়েও করতে পারে। তবে ওকে দেখতে ভালো নয়। কে ওকে বিয়ে করবে? যাক গে, এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। কারণ, বিয়ে করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমি তো বিয়ে করিনি। তাই বলে কি আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে? আমি তা মনে করি না।

কাকলির কথা ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারলাম না। মাঝে মাঝে ভাবি, ও এখন কোথায় আছে, কী করছে? মাঝে মাঝে কাকলির ওপর রাগ হয়। ভাবি যেখানেই থাক না কেন, একটা খবর

দিতে পারে না?

ঠিক একবছর পরে ডোরবেল বাজিয়ে এক সুন্দরী তরুণী ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে চমকে গেলাম। খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। অথচ...

তরুণী হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, চিনতে পারছ?

আমি বিস্ময় কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কাকলি?

কাকলি হেসে বলল, হ্যাঁ।

— তোমার চেহারা, তোমার পোশাক সব যে বদলে গেছে?

— এটা আমেরিকার দান।

আমি তখন হেসে বললাম, বসো।

কাকলি বলল, বসব না। কাজ আছে। — বলে একটা কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে বলল, কাল তাজ বেঙ্গলে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের নিয়ে একটা মিটিং আছে। মুখ্যমন্ত্রী এই মিটিং ডেকেছেন। আমরা এতে পার্টিসিপেট করছি। আমাদের ইচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে একটা গাড়ির কারকানা করব। তুমি আসবে কিন্তু।— বলে কাকলি চলে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কাকলি সম্পূর্ণ আলাদা।

পরদিন যথারীতি আমি তাজ বেঙ্গলে ঢুকলাম। আমাকে দেখে কাকলি আমাকে ডেকে নিল। মঞ্চে পাশে বসাল। শুরু হল বক্তৃতা। কাকলির মামা কাকলির পাশে বসেছিলেন। তিনি বক্তৃতায় বললেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে এখানে এসেছি। ইচ্ছে আছে এখানে একটা গাড়ির কারখানা করব। এই কারখানার দায়িত্ব নিতে আমার স্নেহভাজন কাকলি রাজি হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালি।

তারপর মিটিং শেষ হলো। মঞ্চ থেকে সবাই একে একে নেমে এল। আসার পর সবাই কাকলিকে ঘিরে ধরল। তার মধ্যে আমার বন্ধুর কাকা ছিলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীও ছিলেন।

বন্ধুর কাকা হাত জোড় করে বললেন, ম্যাডাম, আমার ছেলেকে একটা চাকরি দেবেন?

মন্ত্রীও হাত জোড় করে বললেন, আমার ছোট ভাইকে যদি আপনি একটা চাকরির...

কাকলি হাসিমুখে সকলকে আশ্বস্ত করল।

তারপর কাকলি মামাকে নিয়ে একটা বিশাল গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করল। পিছনে দলে দলে লোক ছুটতে লাগল। সকলের একটা চাকরি চাই।

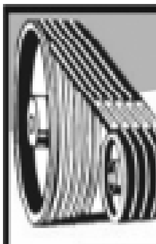

# NAVYUG®

IS : 2494

CM/L NO. 9065679

BSCIC

VINÇOTTE

ISO 9001:2008

ISO/TS 16949:2009

B0089/0104:0807

QUALITY SPEAKS ITSELF

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF:

V, COGGED & POLY BELTS

FOR INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE APPLICATION

*Recognised Export House by Govt. of India*

## NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009

Ph.: 0181-2420551-552-053-054 Fax : 0181-2420553

E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

C ®

BRAND

ISI

MARKED

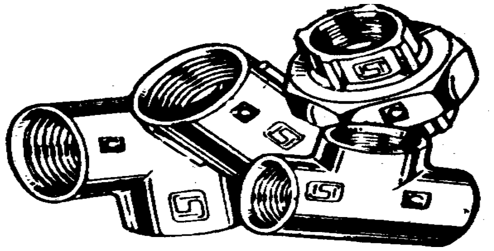

**HIGH GRADE**
**MALLEABLE IRON**
**HOT GALVANISED**
**PIPE FITTINGS**

MFD. BY.

Ph. : 260-1548/1566 R-256305, 257593.

## CRESCENT ENGG. CORP.

G. T. ROAD, BYE PASS, JALANDHAR

# মোক্ষম চাল

শেখর বসু

সোনার গয়নার ব্যবসায়ী ছোট মল্লিকের বড় মেয়ের বিয়েতে এই শহরের বিখ্যাত মানুষদের অনেকেই এসেছেন। তাঁদের সবার কথা বলার দরকার নেই। উপস্থিত আলো পড়ুক মাত্র তিনজনের মুখে। প্রথমজন শিল্পোদ্যোগী এন আর আই মিলন সান্যাল, দ্বিতীয়জন মিলনের হবু শ্বশুর এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমলা রঘুপতি বর্মণ। তৃতীয়জন অর্ডার সাপ্লায়ার বিশ্বনাথ ঘোষাল, যার ঘ্রাণশক্তিকে টেক্কা দেওয়ার মতো প্রাণীজগতে কেউ বোধহয় নেই। নেমন্তন্নবাড়িতে পা দিয়েই খুব বড় একজন খদ্দেরের গন্ধ পেয়েছিল বিশ্বনাথ, তারপর সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকেই পৌঁছে গিয়েছিল আমেরিকা প্রবাসী মিলনের কাছে।

অচেনা কারও সঙ্গে আলাপ জমাতে বিশ্বনাথের তিন মিনিটের বেশি সময় লাগে না। এখানে আলাপ বেশ জমাট হয়ে উঠেছিল হার্ড ড্রিংকসের সুবাদে। ব্যাঙ্কোয়েট হলের একধারে চমৎকার একটা বার বানানো হয়েছে। গ্লাসের পানীয় অর্ধেক হওয়ার আগেই বিশ্বনাথ জেনে গিয়েছিল, মিলন এ দেশে ব্যবসায় বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে চায়। ব্যবসার কাজে সবার আগে জমি দরকার। দশ একর জমির জন্য আবেদন করেছিল সরকারের কাছে। প্রবাসীর বিনিয়োগের ব্যাপারে সরকার খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল। বিনিয়োগের পরিমাণ বেশ ভালো। তাছাড়া বেশ কিছু চাকরির সংস্থান হবে এই প্রকল্পে। একটি জমিও পছন্দ করেছিল মিলন, কিন্তু তারপরেই সব থমকে গেছে। এইভাবে তিনটি বছর কেটে যাওয়ার পরে আমলা রঘুপতি বর্মণের একমাত্র সন্তান সুদর্শনার সঙ্গে মিলনের আলাপ হয়। দুজনকেই দুজনের ভালো লেগে যায়। ভালো লাগা এবার বিয়েতে গড়াবে। কিন্তু এদেশে ব্যবসা ফাঁদার কী হবে? প্রশ্নের উত্তরে মুচকি হাসি হেসে সুদর্শনা বলেছিল, ‘জমি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, বাবা সব ব্যবস্থা করে দেবে।’

কথা শুনে মিলনও হেসেছিল, শুকনো হাসি। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, ‘দেখা যাক।’

বিয়েবাড়িতে দু-নম্বর গ্লাসের স্কচে চুমুক দেওয়ার সময় বিশ্বনাথ আর মিলনের কথায় ওই জমির প্রসঙ্গটা উঠেছিল। রহস্যপূর্ণ একটা হাসি হেসে

বিশ্বনাথ বলল, 'আমি কন্সট্রাকশন কাজের সঙ্গে জড়িত বলে এই ব্যাপারে লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টের খবরটাও আমার কানে এসেছে।' কপালে ভাঁজ পড়েছিল মিলনের। 'কী খবর?'

'খুব শিগগিরই জমি অ্যালটমেন্টের চিঠিটা আপনার হাতে চলে আসবে। খবরটা পেয়েছেন নিশ্চয়ই।'

গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে মিলন বলল, 'আপনার খবরের সোর্স খুব ভালো বুঝতে পারছি, কিন্তু একেবারে শেষের খবরটা আপনি বোধহয় পাননি। আপনাকে ফ্রাঙ্কলিই বলছি, আমার হবু শ্বশুর অন্য একটা জমির বরাদ্দের ব্যাপারে বিচ্ছিরি একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন। জানেন কি?'

ধারেকাছে কেউ নেই, তবু চারদিকে দ্রুত একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে জবাব দিল বিশ্বনাথ, 'হ্যাঁ, কানে এসেছে, তবে আমি বিশাস করিনি।'

'কেন বিশ্বাস করেননি।'

'তার কারণ রঘুপতিবাবুর মতো সৎ ব্যুরোক্রাট আমি আমার জীবনে খুবই কম দেখেছি। ওঁর পক্ষে জমিজমার বিলিব্যবস্থা নিয়ে কোনোরকম কারচুপি করা সম্ভব নয়।'

'নয়?'

'না, কোনোমতেই নয়। আমি লিখে দিতে পারি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মিলন। 'তা আপনি লিখতে পারেন। কিন্তু আপনার লেখা দেখে বিচারক কি সন্তুষ্ট হবেন?'

গ্লাসে একটা চুমুক দিতে দিতে বিশ্বনাথ বোঝার চেষ্টা করল, মিলনের কথাটার মধ্যে কোনো খোঁচাটোচা আছে কিনা।

বোঝার ব্যাপারটা খুব একটা স্পষ্ট হল না। কিন্তু এই মানুষটি কোনো অবস্থাতেই দমে যাওয়ার পাত্র নয়। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বিশ্বনাথ বলল, 'অভিযুক্ত হওয়া মানেই দোষী নয়। এসব ব্যাপারে কোনো অভিযোগ এলে তদন্ত হবেই। তদন্তের পর.. আসলে অমন সৎ, আদর্শবান মানুষের পক্ষে কোনোরকম দু-নম্বরি কাজ করা সম্ভবই নয়।'

বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠেছিল মিলনের মুখে। 'তাই যদি হয়, সেটা তো ভয়ের ব্যাপার।'

হবু জামাই মিলনের কথা শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিল চৌখশ অর্ডার সাপ্লায়ার বিশ্বনাথ। গ্লাসে বড়সড় একটা চুমুক দেওয়ার পরে সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, ভয়ের কথা বলছেন কেন?'

একটু বুঝি হতাশ দেখাচ্ছিল মিলনকে। 'উনি যদি এতই সৎ হন আমাকে ওই জমিটা পাইয়ে দেবেন কীভাবে?'

'কেন, অসুবিধাটা কোথায়?'

'আমার জন্য মার্ক করা ওই জমির মধ্যে বেশ বড়সড় একটা পুকুর আছে। পুকুরের কোনো দরকার নেই আমার। আর অতটা জলা জমি ভরাট করে কন্সট্রাকশনের কাজে লাগানো তো বেআইনি।'

'কী করে জানলেন?'

'খোঁজ নিয়ে জেনেছি। কিন্তু আশা ছিল আমার উড বি ফাদার-ইন ল ওটা ম্যানেজ করে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই দেবেন। ওঁর মতো এফিশিয়েন্ট মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।'

'কিন্তু কী করে দেবেন? আইনের মস্ত একটা ফ্যাকড়া আছে না।'

'তা থাক, উনি ঠিক সামলে দেবেন।'

মিলনের যেন একটু তর্ক করার ঝোঁক চেপেছিল। চাপা খসখসে গলায় বলল, 'কী করে দেবেন? আপনিই তো বললেন— উনি সৎ আদর্শবান, কোনোরকম দু-নম্বরি কাজ করা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়।'

কথাটার সামনে মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল বিশ্বনাথ, তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ছেলেকে, জামাইকে বাড়তি কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়াকে কি দু-নম্বরি বলে? কখনোই না। আমাদের দেশে এটা চলে। ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। এ রাজ্যে সে রাজ্যে কত মন্ত্রী এই কাজটা আকছার করে যাচ্ছে। দেশের মানুষ এর মধ্যে দোষের কিছু দেখে না। বাবার যদি ক্ষমতা থাকে, ছেলের জন্য জামাইয়ের জন্য সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না? আলবত করবে। পাশের রাজ্যের এক মন্ত্রী তো সেবার বিরোধী দলের নেতার প্রশ্নের জবাবে দেহাতি ভাষায় প্রকাশ্যে বলেছিল, 'আমার ছেলের জন্য করব না তো কি তোর ছেলের জন্য করব?'

কথাটা শুনে ঝলমল করে উঠেছিল প্রবাসী বঙ্গসন্তানের চোখ। 'তাই!'

'তা নয়তো কী? বানানো কথা নয়। খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। ইলেকট্রনিক মিডিয়া বারবার দেখিয়েছিল ওই ক্লিপিংটা। খবরটায় মজা পেয়েছিল সবাই। অনেকে আবার সরাসরি বলেছিল— নিয়মের সামান্য বাইরে গিয়ে ছেলে-জামাইয়ের জন্য কিছু করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।'

উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার ছাপটা মিলনের মুখ থেকে উধাও হয়ে গেছে এখন।

গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে বিশ্বনাথ বলল, 'আমার জানার মধ্যে কোনো ভুল নেই, আপনি ওই জমিটা পাচ্ছেনই। আইনগত কোনো বাধা যাতে না ওঠে সেটা রঘুপতিবাবু অবশ্যই দেখবেন। অত্যন্ত কাজের মানুষ উনি, কোনো গোঁজামিল দেওয়া কাজ করেন না কখনো।'

'কিন্তু' শব্দটা উচ্চারণ করার পরে একটু দোনামনা করার পরে মিলন

বলল, 'কিন্তু জমিজমা নিয়ে উনি তো একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন, মানে ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়...'

হাতের গ্লাসের বাকিটুকু গলার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ বলল, 'সত্যিই যদি তাই হয়, রঘুপতিবাবু ওঁর নিজের বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিটি বসাবার ব্যবস্থা করে ফেলবেন।'

আঁতকে উঠেছিল মিলন। 'নিজের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি!'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল বিশ্বনাথের মুখে। 'শুনতে একটু আজগুবি ঠেকছে? ঠেকবেই তো, আপনি বিদেশে থাকেন। এখানে তদন্ত কমিটি বসার আগে পর্যন্ত হইচই হয় পাবলিকের মধ্যে। মিডিয়া রসালো খবর দিয়ে গোলমালটা তুঙ্গে তোলে। কিন্তু কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্ত কমিটি বসে গেলে সব শান্ত হয়ে যায়। মিডিয়া ওই ব্যাপারে আর মুখ খোলে না। আর পাবলিকের মেমারি বলে কিছু নেই, দুদিন বাদে সব ভুলে মেরে দেয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পিছোতে পিছোতে এত পিছিয়ে যায় যে ওই ব্যাপারে লোকের আর কিচ্ছু মনে থাকে না। অনেক তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বারই হয় না শেষ পর্যন্ত। এর মধ্যে আবার রাজ্যের সরকারও পাল্টে যেতে পারে।'

বিষয়টা এবার পরিষ্কার হতেই হাসি ফুটে উঠেছিল মিলনের মুখে।

কাছের মানুষের মতো গলা করে বিশ্বনাথ বলল, 'জমি আপনি পাচ্ছেনই। অফিসবাড়ি, কারখানার কন্সট্রাকশন নিয়ে আপনি আর্কিটেক্টের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিন। আমি প্রতিটি ব্যাপারেই আপনার পাশে আছি। কন্সট্রাকশনের ব্যাপারে সব এক নম্বর মালপত্র আমিই আপনাকে সাপ্লাই করব। এই ব্যাপারে কোনোরকম কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ হবে না। আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই না। আমার চাওয়া বলতে একটাই— দেশের মাটিতে বড় একটা শিল্প গড়ে উঠুক। রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হোক। এখানকার ছেলেমেয়েরা চাকরি পাক। আমেরিকায় আপনার কোনো অভাব নেই। ওখানকার সরকার আপনাকে ব্যবসা করার সবরকম সুযোগ দিচ্ছে, কিন্তু যেহেতু আপনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, যেহেতু দেশের মানুষের জন্য কিছু করা আপনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন, যেহেতু...।'

আবেগতাড়িত হয়ে অর্ডার সাপ্লায়ার বিশ্বনাথ কথাটা শেষ করতে না পেরে একটু 'ম-ম' করল। তারপর পকেট

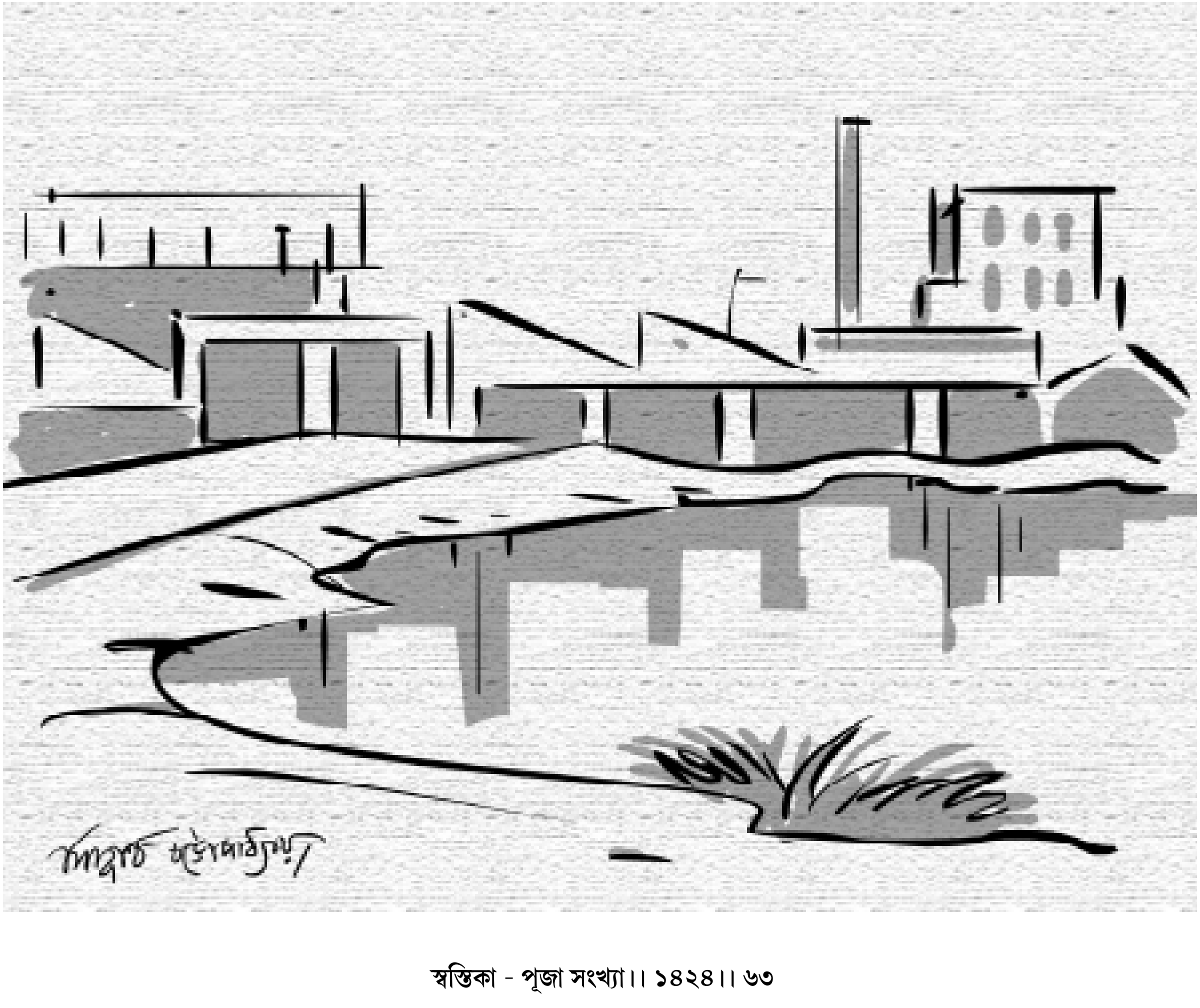

থেকে রুমাল বের করে ঠোঁটের কোণা দুটো মুছে নিয়ে বলল, 'মিস্টার সান্যাল, চলুন এবার আমরা আমাদের ডিনারটা শেষ করে নিই।'

বুফে কাউন্টারে এসে প্রবাসী শিল্পোদ্যোগী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশি অর্ডার সাপ্লায়ার খাওয়া শুরু করল তন্দুরি চিকেন দিয়ে। তারপর গেল টাইগার প্রনে, শেষে ইলিশ মাছের পাতুরিতে। গোটা চল্লিশেক সুস্বাদু পদ ছিল, কিন্তু মাত্র তিনটেতেই রাতের খাওয়া শেষ করল এই দুজন। কিছুক্ষণ বাদে ওরা হাত নেড়ে বিদায় নিয়েছিল পরস্পরের কাছ থেকে।

বিশ্বনাথ যা বলেছিল, তাই ফলে গেল। এক সপ্তাহ বাদে প্রতাপশালী আমলা রঘুপতির বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিটি বসে গেল। দু-সপ্তাহের মধ্যে প্রবাসী শিল্পোদ্যোগী মিলন সান্যাল জমি বরাদ্দের চিঠি পেল হাতে। পরদিন সকালেই ওর বাড়িতে হাজির হয়ে গিয়েছিল বিশ্বনাথ ঘোষাল। ব্যবসার বাইরে মিলনের এখন একটাই বড় কাজ— সেটা হল বিয়ে। চটপট একটা শুভদিন দেখে সুদর্শনার সঙ্গে মিলনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ঘটা করে। এরপর বাকি কাজটিও এগিয়ে গিয়েছিল দ্রুত গতিতে।

বরাদ্দ জমিতে চটপট তৈরি হয়ে গেল মস্ত বড় কারখানা, অফিস। চাকরি পেল অনেকে, কিছু অভিজ্ঞ, আনকোরা ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়। তরুণ এই শিল্পপতির সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকে বিশ্বনাথ। প্রথমে বিশ্বনাথের কাজ ছিল কন্সট্রাকশনের কাজে মালপত্রের জোগান দেওয়া। ওর মালপত্রের দাম বাজার থেকে বেশ বেশি। আসলে সেরা জিনিস আনতে গেলে এটা তো হবেই। বিশ্বনাথের মুখে একটাই বুলি ছিল— কোনো অবস্থাতেই কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করা চলবে না। নতুন এই বন্ধুটির কথায় সায় দিয়েছিল মিলন। এখন তো সব ব্যাপারেই বিশ্বনাথ ওর পরামর্শদাতা।

মিলনের ব্যবসা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। এখন ওর পণ্যের চাহিদার পুরোটা জোগান দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। কারখানা এলাকার মধ্যে বিশাল ওই পুকুরটা ব্যবসার কোনো কাজেই আসছে না। ওটা বুজিয়ে ওখানে আর একটা শেড বানাতে পারলে ব্যবসার মস্ত সুবিধা হবে। কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি হবে বলে জলাভূমি বোজানো আইনবিরুদ্ধ কাজ। বিশ্বনাথ বলল, 'এই ব্যাপারে আপনি একবার আপনার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলুন।'

তাই করল মিলন। রঘুপতিবাবু শান্ত মুখে সব শোনার পরে বললেন, 'কাল তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলব।'

পরদিন সকালেই জামাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রঘুপতিবাবু। ওঁর মুখ এখন কালকের চাইতেও শান্ত। বললেন, 'তুমি চটপট একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকে বলো, জমির অভাবে কারখানা সম্প্রসারণ করতে না পারার জন্য তোমার ব্যবসা মার খাচ্ছে ভীষণ ভাবে। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তাই তুমি ব্যবসা বন্ধ করে বিদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছ।'

ঘাবড়ে গিয়ে মিলন বলল, 'ব্যবসা তো খুব ভালো চলছে। আমি ব্যবসা বাড়াবার জন্য পুকুরটা ভরাট করতে চাইছিলাম। বিদেশে ফিরে যাওয়ার কথা তো একবারও ভাবিনি।'

মুচকি হেসে রঘুপতিবাবু বললেন, 'আমিও তোমাকে এভাবে ভাবতে বলছি না। তোমার ব্যবসা ভালো চলছে, এখানকার অনেকে চাকরি পেয়েছে, রাজস্বখাতে সরকারের ভালো রোজগার হচ্ছে। সামনের নির্বাচনী বক্তৃতায় সরকারের সাফল্যের কাজে তোমার উদাহরণ টানা হবে। সেই তুমি এখন সুযোগের অভাবে লাভজনক ব্যবসা গুটিয়ে বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছ— এটা সরকারের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করা। তাতে হয়তো কাজ হতে পারে।'

বুদ্ধিমান শিল্পপতি মিলনের কাছে পুরো ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ও বলল, 'আমি শিগগিরই প্রেস কনফারেন্স ডাকছি।'

প্রেস কনফারেন্স শেষ হওয়ার পরেই হইচই পড়ে গিয়েছিল মিডিয়া মহলে। এত বড় বিনিয়োগ সরে যেতে বসেছে রাজ্য থেকে। কর্মসংস্থানের এই হাল, তার ওপর আবার নতুন করে বেশ কিছু মানুষ বেকার হবে। তাছাড়া এই দৃষ্টান্তটি রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ আসার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করবে।

কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারল না এই ব্যাপারে। আইনের বাধা আছে।

এক মাস পরে রঘুপতি জামাইকে ডেকে বললেন, 'এটা হবে আমি জানতাম। এবার তুমি পুকুর ভরাট করার কাজ শুরু করে দাও।'

অবাক হয়ে মিলন বলল, 'সে কি! এটা তো বেআইনি কাজ হবে।'

রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছিল রঘুপতির মুখে। 'আইন বড় না মানবিকতা বড়? তুমি জনসমর্থন পাবে। পুকুর ভরাট করার কাজ শুরু করে দাও এবার। পুকুরের চারভাগের এক ভাগ ভর্তি হওয়ার পর খবর দিও আমাকে।'

শ্বশুরের পরামর্শমতো পুকুর ভরাট করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল মিলন। দিন পনেরো পর মিলন বলল, 'আপনি যতটা বলেছিলেন, পুকুরের ততটাই ভরা হয়েছে। এবার কী করব?'

'কাজ বন্ধ করে দাও। এখন যা করার সরকারের বিরোধী পক্ষ করবে। ঠিক আছে, এসো এখন, আমি একটু

বেরুচ্ছি।'

সেদিন ছিল শনিবার, সোমবার সকালেই হইচই উঠল বিধানসভায়। বিরোধী পক্ষের নেতা গলার শিরা ফুলিয়ে বলল, 'কারখানা এলাকার মধ্যে থাকা বিরাট জলাজমি ভরাট করছে মালিকপক্ষ। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে সরকারের বিবৃতি ও উপযুক্ত ব্যবস্থা দাবি করছি।'

খবরটা কানে আসতেই মিলন ঘাবড়ে গিয়ে ছুটেছিল শ্বশুরের কাছে। মৃদু হেসে রঘুপতিবাবু বললেন, 'বিরোধীপক্ষের নেতাকে দিয়ে আমিই খবরটা বিধানসভায় তুলিয়েছি।'

বিস্ময়ের ধাক্কায় মিলনের চোখদুটো প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। 'আপনি!'

'যাও তুমি তোমার কাজকর্ম করো, এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমলা-শ্বশুরের ওপর মিলনের অগাধ আস্থা। ও আর কথা না বাড়িয় মাথা নিচু করে বেরিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে।

মাসখানেক পরে ওই জলাজমি ভরাট করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি বসে গেল। খবরটি সবার আগে পেয়েছিলেন রঘুপতি বর্মণ।

সেদিন ছিল শনিবার। সকাল দশটা নাগাদ রঘুপতি এক বাক্স সরভাজা নিয়ে শিল্পপতি জামাইয়ের বাড়িতে হাজির। অসময়ে শ্বশুরকে দেখে অবাক মিলন। প্রসন্ন হাসি হেসে রঘুপতি বললেন, 'সুখবর পেলে হিন্দিওয়ালারা মু মিঠা করে। তোমরাও করো।'

'কিন্তু সুখবরটা কী?'

আর একদফা হাসলেন রঘুপতি। 'তোমার ওই জলাজমির ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার জন্য এইমাত্র একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছে।'

বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে মিলনে এক মিনিট আর সুদর্শনার দেড় মিনিট সময় লেগেছিল। তারপর ওরা ঝলমলে মুখে বলে উঠেছিল, 'সত্যি, দারুণ খবর! কিছুক্ষণ বাদে সরভাজা খেতে খেতে শিল্পপতি জামাই বলল, 'তাহলে জলাজমির ওপর কারখানার কী ধরনের শেড তৈরি হবে— তাই নিয়ে কি আর্কিটেক্টের সঙ্গে এখন কথা বলতে শুরু করব?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখনই। শুধু কথা নয়, পাকাপাকি প্ল্যান বানাতেও বলে দাও। এ কাজে বেশ সময় লাগে।'

'পুকুর বোজানোর কাজটা কি তাহলে শুরু করে দেব?'

'না, না। এখন নয়। কখন করতে হবে আমি বলে দেব।'

রঘুপতির কথা ও কাজের ধরনের সঙ্গে মিলন বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। ও জানে শ্বশুরমশাই কখনো ঝেড়ে কাশেন না। যতটুকু না বললে নয়, যতটুকু না করলে নয়, তার বেশি কখনো বলেন না, করেনও না। কিন্তু প্রতিটি চালই মোক্ষম। বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিল মিলন। মেজাজটাও দিব্যি ফুরফুরে হয়ে উঠেছিল।

এরপর তিনজনের মধ্যে যেটুকু যা কথা হয়েছিল সবটাই সরভাজা নিয়ে।

# SURYA STEELS

**HIG - 969**

**P.H.B.C. Coloni**

**Jamalpur**

**Ludhiana - 141 010**

# Chander Bhan Suraj Bhan

**Phone : (O) 2461423, 3294291, (F) 2850492**
**Mob. 9319224997**
**Tele Fax : 2461423, (STD-0562)**

AMAR MARKET,

JOHRI BAZAR, AGRA-3

*Manufacturers of*

***All Kinds of Handloom,***

***Durries and Carpets etc.***

# ANOOPAM

**METAL INDUSTRIES**

ISO 9001-2000 Certified

*Manufacters & Exporters*

**AIMEX BRAND ALLEN BOLTS, GRUB SCREWS, ALLEN SCREWS &CYCLE PARTS**

B-6, Textile Colony, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, Fax : 91-161-5013390
e-mail : annopam_met@hotmail.com